প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

La plupart des hommes ont, comme les plantes, des proprietes cachees que le hasard fait decouvrir.

সূ চী প ত্র

P.M.

নোঃ, এবার উঠতেই হল সরোজকে। বাগানে আবার সেই দুড়দাড় শব্দ। দক্ষিণ কোনার গাছটায় একটা আমও অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

ভালো জাতের কলমের আম। পাকলে লোককে ডেকে খাওয়াবার মতো। আর কাঁচায় দুর্দান্ত টক—এক টুকরো দাঁতে কাটলে তিন দিন খাওয়া বন্ধ। অথচ একবার কাণ্ড দেখো মেয়েটার—সেই কাঁচাগুলোরই সর্বনাশ করছে বসে বসে।

আজ চারদিন প্রাণপণে ধৈর্য ধরেছে সরোজ। কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শান্তিপ্রিয় নিরীহ অধ্যাপকের গরমের ছুটিটা মাঠে মারা যেতে বসেছে। ভেবেছিল এই ক'টা দিন নিশ্চিন্তে বসে বসে গোটা কয়েক মোটা মোটা ফিলসফির বই পড়বে, কিন্তু এভাবে উৎপাত চললে কাঁহাতক আর---

মা তো দিব্যি মাসিমার সঙ্গে পুরীতে গিয়ে বসে আছেন। বাড়িতে একদম স্বরাজ। চাকরটা সেই সাড়ে দশটার সময় যা-খুশি রেঁধে দিয়ে কোথায় দেশোয়ালীদের আড্ডায় অদৃশ্য হয়—চারটের আগে তার টিকি দেখবার জো নেই। অথচ এই নতুন ভাড়াটেদের উৎপাতে সরোজের প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম।

বাগানের ও-দিকের ছোট বাড়িটা মা-ই ভাড়া দিয়েছেন তাঁর ছেলেবেলার 'ডুমুরফুলকে'। এই 'ডুমুরফুলটি' এতদিন বর্ধমান না কোথায় অদৃশ্য হয়ে ছিলেন, তাঁর স্বামী বদলী হওয়াতে এখানে এসে অধিষ্ঠান করেছেন। সরোজের তাতে আপত্তি ছিল না—কিন্তু ডুমুরফুলের মেয়েটিই জেরবার করে তুলেছে তাকে।

এবং, আরো ভয়ঙ্কর কথা ঃ মা নাকি হাসতে হাসতে ডুমুরফুলকে বলেছেন, বুনোর সঙ্গে সরোজের বিয়ে দিলে কেমন হয় ?

মেয়েটির ভালো নাম বনানী। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস হবে—দেখতে শুনতে খুব খারাপ, এ-কথাও বলা যায় না। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু হলে কী হয়, এমন একটা দুর্দান্ত মেয়ে সরোজ জীবনে দেখেনি। রোজ দুপুরে এসে বাগানে ঢোকে কাঁচা আমের সন্ধানে। তলায় বসে দু-চারটে খায় তো খাক—কিন্তু গাছে চড়ে একরাশ কাঁচা আমের শ্রাদ্ধ না করলে তার ভালো লাগে না। বুনোই বটে। এমন লাগসই নাম আর হয় না!

ওই মেয়েকে বিয়ে করা! যদি ঠাট্টাও হয়—তবু কী ভয়াবহ ঠাট্টা! শান্তিপ্রিয় তরুণ অধ্যাপক সরোজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝাঁকুনি লাগল একবার।

আবার গাছের ডালে সেই ঝর্-ঝর্ আওয়াজ। ডাল ভেঙে পড়বে নাকি! তা পড়ুক—হাত-পা ভেঙে মাসখানেক হাসপাতালে থাকলে খুশীই হবে সরোজ। কিন্তু আমগুলো—

অগত্যা বেরুতেই হল সরোজকে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই। ঠিক সেই গাছটারই মগডালে উঠে বসেছে। একফালি লাল শাড়ি আর কোঁকড়া চুলের ভিতর একটি ফুটফুটে মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ভালোমানুষ বাপটি নয় সাইকেল নিয়ে অফিস বেরিয়েছেন, কিন্তু ডুমুরফুল-মা কী করছেন বসে বসে ? একটু সামলাতেও পারেন না মেয়েকে ?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সরোজ।

—শুনছেন ?

গাছের মাথায় বুনো চমকে উঠল। আজ মাসখানেক হল সরোজ কলকাতা থেকে এসেছে—কিন্তু গ্রন্থকীট মানুষটি বই থেকে মুখ তুলে পর্যন্ত তাকায়নি ভালো করে। এমন অসময়ে হঠাৎ তার এই সম্ভাষণের জন্যে বুনোর মত বুনো মেয়েও তৈরি ছিল না।

—শুনছেন ?—সরোজ আবার ডাকল।

এবার যা ঘটল তা অপ্রত্যাশিত। উপর থেকে একটা চাপা তর্জন ভেসে এল : চুপ করুন—চ্যাঁচাবেন না এখন।

সরোজ স্তম্ভিত। গলায় একটা গম্ভীর শাসনের সুর এনেছিল, তৎক্ষণাৎ মিইয়ে গেল সেটা।

—দেখুন, আমি বলছিলাম—

গাছের উপর থেকে আবার সেই বিরক্ত শাসন ভেসে এল : একটু পরে বলবেন। এখন চুপ করে থাকুন তো।

সরোজ এবার থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উল্টো তাকেই শাসন করে যে! ইচ্ছে হল কান ধরে একটা চড় বসিয়ে দেয় মেয়েটার গালে। কিন্তু কানটা আপাতত অনেক উপরে—অত দূরে তার হাত গিয়ে পৌঁছুবে না।

মেয়েটা তর্ তর্ করে আরো উপরে উঠছে। সর্বনাশ—যাচ্ছে কোথায়! একেবারে সরু সরু ডাল ওখানে, একবার ভেঙে পড়লে যে দেখতে হবে না আর!

বিস্ফারিত চোখে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সরোজ বলে ফেলল : কোথায় উঠছেন ? পড়ে মরবেন যে!

—মরি তো মরব—আপনার কী! বললাম না—চুপ করে থাকুন ? তবু সমানে বক্ বক্ করে চলেছেন তখন থেকে!

অপমানে সরোজের কান লাল হয়ে উঠল। সাহস ছাখো একবার। যা মুখে আসে তাই যে বলছে! তার কলেজের ছাত্রী হলে তৎক্ষণাৎ ওই মেয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করত সে।

আপাতত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা আর অসহ্য ক্রোধে জ্বলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। দেখাই যাক—কী করে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই উপর থেকে জয়ধ্বনি শোনা গেল : ধরেছি!

সরোজ ভেবেছিল, বুনো নেমে না আসা পর্যন্ত চোখ পাকিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু কৌতূহল সামলাতে পারল না : কী ধরেছেন ?

—পাখিটা।

—কী সর্বনাশ ! পাখির ছানা পাড়ছেন গাছ থেকে ?

উপর থেকে আকাশবাণীর মতো শোনা গেল : ছানা পাড়ব কেন ? ধেড়ে পাখি।

ধেড়ে পাখি ! বলে কী ? দিনে-দুপুরে গাছ থেকে ধেড়ে পাখি ধরছে ! বন-বিড়ালের পক্ষেও কাজটা সম্ভব কিনা, এ সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে সরোজের।

—বলেন কী ! কী করে ধরলেন ?

এবার উত্তর এল না, শোনা গেল একটা আর্ত কাতরোক্তি : উঃ !

—কী হল ?

—কামড়ে দিচ্ছে।

—কামড়াবেই তো। যেমন বুনো পাখি ধরতে গেছেন—

পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল শাড়ি-পরা দুখানি ফর্সা পা নেমে আসছে। আবার ধমক এল : আঃ—থামুন না। কিচ্ছু বোঝেন না—সমানে কথা কইছেন।

এবার আর সরোজ রাগ করল না। সকৌতুক কৌতূহলে অপেক্ষা করতে লাগল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই এক হাতে একটা ডাল ধরে দোল খেয়ে ঝুপ করে মাটিতে নেমে পড়ল বুনো। মেয়েটা ইচ্ছে করলে সার্কাসে ভিড়ে যেতে পারত।

সরোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গায়ে নীল ছিটের ব্লাউজ, শাড়িটা গাছ-কোমর করে কষে বাঁধা। মাথার চুলগুলো এলো-মেলো—একটা শুকনো পাতা আটকে আছে তাতে। ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে এঁটে ধরা সবুজ রঙের পাখি একটা।

মুগ্ধ বিস্ময় সামলে নিয়ে সরোজ বললে, কী পাখি ওটা ?

বুনো অল্প অল্প ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলছিল। কালো চোখের একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ ফেলল সরোজের মুখের উপর।

—চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছেন না ? টিয়া।

—টিয়া ? আপনি তো সাংঘাতিক দেখছি ! গাছ থেকে বুনো টিয়া নামিয়ে আনলেন ?

বুনোর কালো চোখ দুটো আবার জ্বলজ্বল করে উঠল।

—বুনো টিয়া কে বললে আপনাকে ? পোষা। খাঁচা কেটে পালিয়ে গেছে সকালে। দুপুরবেলা ফিরে এসে মোটা গলায় আমায় ডাকছিলঃ বুনো, খেতে দে। সেই তখন থেকে ধরতে বেরিয়েছি। তাও কি সহজে ধরা দেয় ? এ-গাছ থেকে ও-গাছ—এ ডাল থেকে সে ডাল। ধরেছি শেষতক। কিন্তু কী নেমকহারাম দেখুন ! দু বছর ধরে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করেছি, অথচ আমাকেই কামড়ে রক্তারক্তি করে দিলে।

তাইতো—এতক্ষণ নজরেই আসেনি যে ! বুনোর ডান হাতের কব্জী থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

—সর্বনাশ, এ কী হয়েছে !—গ্রন্থকীট সরোজ হঠাৎ বেয়াড়া কাজ করে বসল একটা। খপ করে চেপে ধরল হাতখানাঃ আসুন—আইডিন দিয়ে দি !

মুহূর্তে বদলে গেল বুনোর মুখের রঙ। একবার শিউরে উঠেই শক্ত হয়ে গেল শরীর।

—না-না থাক।

—থাকবে কেন ? আসুন শিগগির। ওদের ঠোঁটে নানারকম বিষ থাকে—সেপটিক হয়ে যাবে শেষকালে।

—বড্ড জ্বালা করবে আইডিনে।

—গাছে উঠতে পারেন ভর দুপুর বেলা—অথচ আইডিনে ভয় ?

—বুনোর রাঙা হয়ে আসা মুখ আর আধ-বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে এবার ধমক লাগালো সরোজ ঃ আস্থন বলছি—

বুনোর হাতের মুঠোয় বন্দী টিয়াটা কটর কটর শব্দে প্রতিবাদ জানালো একবার।

আইডিন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছুটে পালিয়েছে বুনো। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে, সরোজের কাছে তার এবার লজ্জা পাওয়া উচিত।

সরোজ আবার এসে পড়ার টেবিলে বসল। ত্নপুরটা একেবারে মাটিই করে দিয়েছে পাহাড়ে মেয়েটা। দর্শনের যে জটিল রাজত্বে এতক্ষণ সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আবার তার অনেকটা সময় লাগবে সেখানে ফিরে যেতে! ডুমুর ফুলকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে কী উৎপাতই মা টেনে এনেছেন ঘাড়ের উপর!

কিন্তু কিছুতেই মন বসছে না। কী ত্নরন্ত মেয়ে! কোথায় গিয়ে উঠেছিল! ডাল ভেঙে যদি একবার নীচে পড়ত—

সরোজ শিউরে উঠল। তাই তো—খাঁচাটা তো কাটা। আবার যদি পাখিটা পালায়? ফের বুনো অমনি করে উঠবে নাকি মগডালের উপর? আর সারাটা ত্নপুর তার পড়াশুনো একেবারে মাঠে মারা যাবে? ত্নরু-ত্নরু বুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে বুনোর কাণ্ড-কারখানা?

সম্ভাবনাটা মনে আসতেই ত্নশ্চিন্তায় সরোজ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এর একটা প্রতিকার করা দরকার। এবং এখুনি। ভারী নেমকহারাম পাখিটা। ফাঁক পেলেই তো পালাবে। তা হলে?

চাকরটা সেই সাড়ে দশটায় সরে পড়েছে—ফিরতে চারটের আগে নয়। অগত্যা বাড়িতে তালা দিয়েই সরোজকে বেরুতে হল।

এবং আরো ত্নু ঘণ্টা পরে ঘর্মাক্ত হয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল মায়ের ডুমুরফুলের বাসায়।

ডুমুরফুল—অর্থাৎ মাসিমা ডালের বড়ি দিচ্ছিলেন। পাশে বসে বুনো আঙুলের ডগায় চাটছিল তেঁতুলের আচার। দু'জনেরই চমক লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল বুনো।

মাসিমা বললেন, একি—সরোজ যে! এতদিনে গরীব মাসিমাকে মনে পড়ল? এসো বাবা—বসো। হাতে ওটা কী নিয়ে এসেছ?

হঠাৎ ভারী অপ্রতিভ—ভারী লজ্জিত হল সরোজ। একবারের জন্যে কথা আটকে গেল গলায়। কিন্তু যা হওয়ার হয়েই গেছে—আর ফেরবার পথ নেই এখন।

—এই-এই নতুন খাঁচাটা—ঢোঁক গিলে সরোজ বললে, বুনো—মানে বনানীর জন্যে—

বুনো কী বুঝল কে জানে। দুরন্ত দুষ্টু মেয়েটা সোজা পালিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। শুধু চকিতের জন্যে কালো চোখের এক পশলা বিদ্যুৎ দেখতে পেলো সরোজ।

আর সেই পালিয়ে যাওয়ার কী একটা অর্থ ধরা পড়ল মায়ের কাছে। একবার সরোজের লজ্জিত মুখের দিকে, আর একবার তাকালেন খাঁচাটার দিকে। হাসলেন সস্নেহে।

বললেন, ভালোই করেছ—বুনোর একটা খাঁচা এখন সত্যিই দরকার। বোসো বাবা, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও।

কাছেই, একটা চুবড়ীর তলায় ঢেকে রাখা টিয়াটা আবার প্রতিবাদ করল: কট্‌-কটর-কটর—

বিকেলের রোদটা একটু নরম হয়ে আসতেই গঙ্গায় আশ্চর্য হাওয়া উঠল। বড় বড় ঘাসগুলোতে দোলা জাগল, মাথার উপরে ছাতিম গাছটার পাতায় দক্ষিণা বাতাসে সুন্দরবনের অরণ্য-মর্মর শোনা গেল।

আর সেই সময়, যখন সেই আশ্চর্য হাওয়ায় গঙ্গার কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘাসের ভিতর পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে অনেকখানি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায়—সেই তখন জ্যাঠামশাই বললেন, এইখানে একটু শুয়ে পড়ি। ভারী ঘুম আসছে।

লতিকা আশ্চর্য হয়ে বললে, সে কি জ্যাঠামণি—এখন ঘুম? চলো না, গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে ওই বাঁকটা পর্যন্ত ঘুরে আসি।

জ্যাঠামশাই একটা হাই তুললেন ঃ তোমার বয়েস উনিশ আর আমার বাষট্টি—এ কথাটা খেয়াল রেখো। তার উপরে 'গাউটটা' আবার চিড়বিড়িয়ে উঠছে টের পাচ্ছি। কাজেই, গঙ্গার বাঁক কেন, তোমরা যদি বে অব বেঙ্গল পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চাও, তাতেও আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে—পাদমেকং ন গচ্ছামি।

জেঠিমা বললেন, সেই ভালো, আমিও বসি। বেশ মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে—নড়তে ইচ্ছে করছে না এখান থেকে।

লতিকা বিরক্ত হল ঃ তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে আসাই ঝক্‌মারি। গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে বসলেই ঠিক হত। সে যাই হোক, আমি একাই যাব। সুদেবদাকে বরং তোমাদের পাহারায় রেখে যাচ্ছি।

শূন্য টিফিন-ক্যারিয়ারটা গাড়িতে রেখে সুদেব ফিরে আসছিল। বিকেলের নরম রোদে তাকে অদ্ভুত রকমের দীর্ঘকায় আর বলিষ্ঠ বলে মনে হল—যেন চলন্ত একটা ব্রোঞ্জের মূর্তির মত দেখাল তাকে।

জেঠিমা বললেন, তা কেন—সুদেবও সঙ্গে যাক। ও তো আর আমাদের মতো বুড়িয়ে যায়নি—ঘুরেই আসুক না তোর সঙ্গে।

তখনও কিছু মনে হয়নি। নরম ঘাসের ভিতরে পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে ডুবিয়ে প্রায় নির্জন গঙ্গার ধার দিয়ে দু'জনে যখন পাশাপাশি অনেকটা হেঁটে গিয়েছিল, তখনও না। তারপর এক সময় যখন ওরা গঙ্গার বাঁকটা পার হল, সূর্য যখন জলের ওপর লাল আর কালো রঙের দুটো তুলি একসঙ্গে বুলিয়ে দিলে, তখন সুদেব বললে, এসো, আমরাও একটু বসি।

—বোসো—লতিকাই আগে পা মেলে দিয়ে আসন নিলে ঘাসের উপর। সুদেব পাশে বসল। বেলা-শেষের রঙ মাখানো ঘাসে ঢেউ খেলতে লাগল।

মনে হল সেই তখন। সুদেব একবার লতিকার মুখের দিকে সবখানি দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে তাকাল, লতিকার চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল একবার। তারপর লতিকা মাথা নিচু করে ঘাসের শিষ ছিঁড়তে লাগল, আর সুদেব ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল লাল-কালো জলের উপর কেমন করে এক একটা শুশুক দীর্ঘশ্বাস টেনে টেনে ডিগবাজি খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। সুদেবই শেষে কথা কইল।

—লতা, তুমি কি জানো—

লতিকা একখানা নরম নিটোল হাত সুদেবের হাতের উপর রাখল: থাক, বোলো না। আমি সব জানি।

আবার চুপচাপ। দুজনে আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে বসে রইল। ঠিকই বলেছে লতিকা—সুদেব ভাবল। মুখের কথার

চাইতেও হাতের ছোঁয়ায় অনেক বেশি বলা হয়ে চলেছে। অনেক বেশি।

সামনে দিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলে একটা মোটর লঞ্চ বেরিয়ে যাওয়ার পর লতিকাই আবার কথা শুরু করল ঃ আজ এত সহজেই তোমার কাছে মনটাকে মেলে দেব ভাবিনি।

লতিকার অনামিকায় আংটিটার শীতল কাঠিন্য কিছুক্ষণ অনুভব করল সুদেব। আস্তে আস্তে বললে, জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়াগুলো এমনি ভাবেই হঠাৎ দেখা দেয় লতা। আকস্মিকতাই তাদের সৌন্দর্য।

হাতটা একবার টেনে নিয়ে লতিকা শাড়ির আঁচলে নিজের কপালটা মুছে ফেলল।

—জ্যাঠামণি আর জেঠিমাই এমনভাবে সুযোগ করে দেবেন—কে জানত! বাড়িতে এত লোক যে তার মধ্যে এক মিনিটের জন্যেও তোমাকে আলাদা করে পাওয়ার উপায় নেই। আজকের এই নির্জন সন্ধ্যাটা যেন হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল আমাদের কাছে।

—অথচ ওঁদের সঙ্গে এখানে বেড়াতে আসবার আজ আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না!—মুঠোর মধ্যে আর একবার লতিকার হাতখানি সংগ্রহ করে এনে সুদেব বললে, না এলে কী ভয়ঙ্করভাবে ঠকে যেতাম! হয়তো কোনোদিন তোমাকে জানাই হত না।

—আমিও আসতে চাইনি—চশমার আড়ালে আর একবার ঝকঝক করে উঠল লতিকার দৃষ্টি ঃ অনেক আপত্তি করেছিলাম, মনে হয়েছিল বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু কী অদ্ভুত যোগাযোগ ছাখো। তুমি ভাগ্য মানো?

—ভাগ্য মানিনে, সৌভাগ্য মানি।

লতিকার নাকটা ধরে আদর করে নেড়ে দিতে ইচ্ছে হল সুদেবের। কিন্তু ঠিক ডাঙার কোল ঘেঁষেই একখানা ডিঙি চলেছে—সাহস হল না।

আরও খানিক পরে লতিকা বললে, চলো, এবার ফিরে যাই। আর দেরি করলে জেঠিমার সন্দেহ হতে পারে।

মৃদু নিশ্বাস ফেলল সুদেব।

—রিয়্যালিটিটা কী নিষ্ঠুর! চলো।

ফেরার পথে পায়ের তলাকার ঘাসগুলোকে আরও নরম বলে মনে হল। অন্ধকার গঙ্গার কলধ্বনিতে যেন সেতারের ঝঙ্কার শোনা যেতে লাগল। বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল জ্যাঠামশাই উঠে বসেছেন, আবছা অন্ধকারে জ্বলছে তাঁর চুরুটের অগ্নিমুখটা।

আর এক রবিবার। আর এক নরম রোদে ছাওয়া বিকেল। গঙ্গার ধারে ঠিক সেই জায়গাটিতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তেমনি ঘন ঘাসের দোলা। ছাতিমের পাতায় সুন্দরবনের সেই অরণ্য-মর্মর।

কিন্তু এবার অনেক কষ্টে জ্যাঠামণিকে রাজী করাতে হয়েছে লতিকার।

একজন নামজাদা অ্যাডভোকেটকে নিজের ব্যূহ থেকে বের করে আনা সপ্তরথী-ভেদের চাইতেও দুরূহ কাজ। একটি বিশেষ রবিবারের হঠাৎ বেহিসেবী বেরিয়ে পড়ার খুশিটা জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্রে দস্তুরমত ব্যতিক্রম। আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বিস্তর পরিশ্রম করতে হল লতিকাকে।

রাজী হয়েও জ্যাঠামশাই গুঞ্জন করতে লাগলেন।

—কালকের ফার্স্ট আওয়ারেই একটা জরুরি মামলা—কাগজ-পত্রগুলো—

—ভালোই হবে। একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে এলে মামলার পয়েন্টগুলো তর্ তর্ করে বেরিয়ে আসবে। পিতৃহীন আদুরে ভাইঝিটিকে ঠেকান গেল না। একটা ক্ষুণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাঠা-মশাই বললেন, আচ্ছা। তারপরে আপত্তি তুললেন জেঠিমা।

—আমি কী করে যাই? আজ বিকেলে যে কালীঘাটে রমার

বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে।—অবশ্য জেঠিমা না গেলেও যে কোনো ক্ষতি আছে তা নয়। কিন্তু লতিকা ভেবে দেখেছে যে, জেঠিমা সঙ্গে না থাকলে একটা উড়ো বিপদ এসে দেখা দিতে পারে। হয়তো ফস্ করে জ্যাঠামণি বলে ফেলবেন, বা-রে, বেতোরুগী বলে আমি একাই বসে থাকব নাকি ? তোরাও এইখানেই বোস্ না—গল্প-টল্প করা যাক।

তারপরে, অবধারিতভাবেই জ্যাঠামণির কাছে বসতে হবে। আর তিনি শুরু করবেন আদালতের সেই সব প্রাণঘাতী গল্প—কেমন করে সূক্ষ্মতম একটি আইনের প্যাঁচ কষিয়ে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করে দিয়েছিলেন তিনি, অবধারিত হারের মামলাকে ম্যাজিকের মতো জিতে নিয়েছিলেন। অতএব, সেই ভয়াবহ সম্ভাবনা রোধ করবার জন্যে জেঠিমাকে চাই।

—আহা, কালীঘাট তো আর সাতশ, মাইল দূরে নয় ! ফেরার সময় রমাদির ওখানে হয়ে এলেই চলবে।

শেষ পর্যন্ত সুদেবে এসে ঠেকল। জ্যাঠামশাই বাধা দিলেন আবার।

—না-না, ওকে আর টানাটানি করে দরকার নেই। একমাস পরে ওর এম-এ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে—একটা সন্ধ্যা আর নষ্ট করা কেন ?

—ওঃ, ভারী তো !—লতিকা ঠোঁট ওল্টাল : দু বছর পুরো ক্লাশ করেও যদি পড়া না হয়ে থাকে, তা হলে আজ সন্ধ্যেয় ঘণ্টা দুই বেশি পড়লেও এগোবে না।

—বুঝতে পারছিস না, জ্ঞাতির ছেলে, আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করে, একটা দায়িত্ব—

—দুধের খোকা কিনা, নিজের ভালোমন্দ বোঝে না !—লতিকা আবার ঠোঁট ওল্টাল : সন্ধ্যেয় পড়ার কথা বলছ, এক একদিন আড্ডা দিয়েই তো ফিরে আসে ন'টার পরে। সুদেবদা-ও চলুক

সঙ্গে—একবার থেমে লতিকা বললে, নইলে পাহারা দেবে কে তোমাদের ?

এতখানি উদ্যোগ-পর্বের পরে সেই বিকেল। সেই গঙ্গার ধার। সেই ঘাসের ঢেউ।

প্রথম অধ্যায়টা কী বিরক্তিকর ভাবে দীর্ঘায়িত আজকে! টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে খাবারের প্লেটগুলো সাজাতেই যেন দশ মিনিট লাগল জেঠিমার। তারপর জ্যাঠামশাইয়ের খাওয়াই আর শেষ হয় না। এক টুকরো রুটি হাতে নিয়ে এমন একটা চিটিং কেসের গল্প জুড়ে দিলেন যে, শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল লতিকার।

সে পালাও যখন মিটল, তখন একটা বেয়াড়া আবদার করে বসলেন জ্যাঠামশাই।

—চল্, আজ তোদের সঙ্গে আমিও একটু হেঁটে আসি।

জেঠিমা পানের কৌটো থেকে প্রকাণ্ড দু খিলি পান মুখে পুরে বললেন, সে তো ভালো কথাই। নড়তে তো চাও না—এসোই না একটু হাত-পা খেলিয়ে।

শুনে, চোখ কপালে তুলল লতিকা।

—সে কি কথা! বেশী হাঁটাহাঁটি করে বাতটা যদি বেড়ে যায় জ্যাঠামণি ?

জ্যাঠামশাই বললেন, তা বটে! তবে আজ ভালো আছি—ফিলিং কোয়াইট্ ফিট। খানিকটা হেঁটে এলে মন্দ হবে না।

—না-না, রিস্ক নেবার কোনো মানে হয় না।—লতিকা প্রতিবাদ তুলল: আমাদের জন্যে তোমায় কষ্ট করতে হবে না জ্যাঠামণি।

—তা হলে তুমি একটু ঘুরে এসো না লতার সঙ্গে: জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বিকল্প প্রস্তাব তুললেন জ্যাঠামশাই: সুদেব বরং আমার কাছে বসুক।

লতিকার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল এসে। একটু হলেই সুদেবের হাত থেকে খসে পড়ত চায়ের পেয়ালাটা। জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহ-সুন্দর মুখখানা বেলা-শেষের লাল্‌চে আলোয় জল্লাদের মুখের মত মনে হল।

স্যাণ্ডালটা পরে নিয়ে জেঠিমা উঠে দাঁড়াতে চাইছিলেন—মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টাটা করল লতিকা। আঁকড়ে ধরল তৃণখণ্ড। বিবর্ণ হাসি হেসে বললে, যেতে চাও চলো, কিন্তু ওদিকে ঘাসের ভেতরে দু'চারটে জোঁক আছে জেঠিমা!

শেষ অস্ত্র বটে, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র। জেঠিমা লাফিয়ে উঠলেন—যেন এক্ষুণি তাঁকে জোঁকে ধরেছে।

—জোঁক!

—বেশি নেই, দু একটা মোটে।—লতিকা অভয় দিতে চেষ্টা করল: আমার জুতো বেয়ে একটা সেদিন উঠে আসছিল, একটু হলেই ধরত।

—থাক, থাক তবে।—জেঠিমা আর্তনাদ করে উঠলেন: তবে বাপু তোমরাই বেড়াও। আমি এখানেই বসি।

বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথর নামল এতক্ষণে। এতক্ষণে সহজভাবে সুদেবের দিকে তাকাল লতিকা।

—কী সুদেবদা, তোমারও কি জোঁকের ভয় আছে নাকি? যাবে আমার সঙ্গে, না বসবে?

অসহ্য স্নায়বিক পীড়নের জেরটা এখনও চলছিল সুদেবের মধ্যে। কাঁপা শুকনো গলায় বললে, না-না, জোঁকে আমার ভয় নেই।

আবার ঘাসের মধ্যে পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে ডুবিয়ে পাশাপাশি অনেকখানি হেঁটে যাওয়া। গঙ্গার জলে লাল-কালোর রঙ। ঢেউয়ের কুলুকুলু। তারপর বাঁক ঘুরে সেই জায়গাটিতে পৌঁছান—যেখানে সেদিন হাতে হাত মিলিয়ে বসেছিল ওরা।

সুদেব বললে, এসো, বসা যাক্।

লতিকা বললে, [illegible]। [illegible]

কিন্তু আজকে লতিকার হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে অদ্ভুত কঠিন আর নিষ্প্রাণ মনে হল সুদেবের। আর ক্লান্ত-পীড়িত দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে রইল লতিকা। সেদিন যে মুহূর্তটি আপনি ধরা দিয়েছিল, পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে পাওয়া একখণ্ড হীরের মতো মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল—আজ তাকে নতুন করে পাওয়ার জন্যে কী কুশ্রী উদ্যম ব্যয় করতে হয়েছে সারাদিন! নিজের সেই নগ্ন নির্লজ্জতা এতক্ষণ পরে একটা অসহ্য গ্লানির মতো লতিকার মনকে কালো করে দিতে লাগল! যা আপনি হয়ে ওঠে—তাকে জোর করে গড়ে তুলতে যাওয়া যে এত কুৎসিত—সে-কথা কে ভেবেছিল!

পুরো পাঁচ মিনিটও বসে থাকতে পারল না লতিকা। ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো, জ্যাঠামণির কাছেই ফিরে যাওয়া যাক।

সার্কাসে এসে বসবার পর থেকেই লোকটার অস্বস্তির আর সীমা ছিল না।

ডানধারে তার স্ত্রী। মহিলা মাথায় তার উপরে আরো আধ হাত উঁচু, গায়ের জোর তার চাইতে দ্বিগুণ। অফিসের দীনতম কেরানীর ভূমিকায়, সব চাইতে কম মাইনে পাওয়ার উপেক্ষায় আর অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে চার আনা সুদে ধার করবার তুচ্ছতায় যখন এই ছোটখাটো মানুষটি আরো রোগা—আরো বেঁটে হয়ে গেছে, তখন তার স্ত্রী কেমন করে তাকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে উঠেছে, সে-রহস্য তার অজানা।

স্ত্রীকে এখন সে ভয় করে।

অবশ্য ভয় করবার অভ্যেস তার ছেলেবেলা থেকেই। পাঁচ বছর বয়সে মা-বাপ হারিয়ে কাকার সংসারে সে বড় হয়েছে। স্নেহ যত পেয়েছে, শাসন পেয়েছে তার চারগুণ। খুড়তুতো ভাই মলয়দাকে আজো সে ভুলতে পারে না। নামেই মলয়, আসলে পাড়ার জিম্ন্যাস্টিক ক্লাবের দোর্দণ্ড পালোয়ান। রোজ রাত্রিতে মলয়দা ঘুমোবার আগে তাকে তাঁর হাত-পা টিপে দিতে হত। শীত-গ্রীষ্ম—বারো মাস। যদি মলয়দা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই তার চোখে কখনো ঘুম নেমে আসত, তা হলে তৎক্ষণাৎ বাজের মত একটা চড় এসে পড়ত গালে। সেই চড়ের চোটে কতদিন সে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে খাট থেকে। খুড়িমা বলতেন, "ভালোই হয়েছে, মিন্‌মিনে গোবর-গণেশ একটা—

তারপর একদিন মুক্তি পেল মলয়দার হাত থেকে। চাকরি

জুটল, বিয়ে হল। বেশ লাগল কিছুদিন। নিজের একটা নতুন মূল্য খুঁজে পেল সে। কিন্তু আস্তে আস্তে দীনতম কেরানীর মেরুদণ্ডটা টান-পড়া ছিপের মত নুয়ে পড়তে লাগল নীচের দিকে, আর তার স্ত্রী তাকে ছাড়িয়ে উঠতে লাগল উপর দিকে।

এখন বাড়িওলার সঙ্গে জল আর ইলেকট্রিক লাইন নিয়ে স্ত্রী-ই ঝগড়া করে; রিক্শা করে মাসের বাজার করে আনে স্ত্রী-ই। পাওনাদার তাড়াবার ভারও তার হাতে আর নেই। অফিসের একটা কোনার টেবিলে নিজের অস্তিত্বকে একরাশ ফাইলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করবার নেই তার।

বড়দিনের ছুটি ছিল আজ। ইচ্ছে ছিল, দুপুরবেলা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে, তারপর গড়ের মাঠের কোন একটা নিরিবিলি জায়গায়, একরাশ মরা-মরা লালচে ঘাসের ওপর শুয়ে একটার পর একটা বিড়ি টানবে সে। কিন্তু স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে তাকে সার্কাস দেখতে আসতে হয়েছে।

রোপ্-ট্রিক, প্যারালাল বার, কুকুরের খেলা, টিয়া পাখির কামান ছোড়া, চোখ বেঁধে একজন মানুষের দু পাশ দিয়ে ছোরার মালা গেঁথে দেওয়া—এগুলো দেখে গেছে একটার পর একটা। কিছু দেখেছে খালি চোখ দিয়ে, মন দিয়েও দেখেছে কিছুটা। তবু যে-কোন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আতঙ্কের মতো পাশে তার স্ত্রীর অস্তিত্বকে সে কোনমতেই ভুলতে পারেনি। এমন কি ক্লাউনের কাণ্ড দেখে যখন গ্যালারির অর্ধেক লোক পেটে হাত চেপে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে, তখনো সে প্রাণপণে হাসিকে চেপে রাখবার চেষ্টা করেছে—ফলে এক-একটা অদ্ভুত জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে এসেছে তার গলা দিয়ে।

কিন্তু অস্বস্তিটা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলার সময়।

আকাশ-সমান উঁচু তাবুর মাথার উপর সে কী কাণ্ড! একটা ট্রাপিজ থেকে দোল খেতে খেতে আর-একটায় যেন উড়ে যাচ্ছে লোকগুলো। নীচে জাল আছে বটে, তবু তার মনে হচ্ছিল যদি একজন জালের বাইরে ঠিকরে পড়ে হঠাৎ—কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয় তা হলে! ভাবতে ভাবতে যখন একটা খোসা-ছাড়ানো বাদাম মুখে দিয়েছে, তখন ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলার চাইতেও আরো একটা ভয়াবহ জিনিস সে আবিষ্কার করল।

সার্কাস-রিঙের একেবারে সামনের চেয়ারগুলোতে একটা চকচকে টাক আর ওভারকোটের ভাঁজকরা কলার অনেকক্ষণ ধরেই আবছা আবছা চোখে পড়ছিল। এতক্ষণে সেই টাক আর কোটের মালিক কমলা-লেবু খেতে খেতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছেন, আর সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে: লোকটি আর কেউ নন— তাদের অফিসের ছোটসাহেব।

সেই ছোটসাহেব—যিনি মাত্র দিনকয়েক আগেই একটা ফাইল তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে গিয়েছিলেন তার মুখের উপর। সেই ছোটসাহেব—যাঁর পায়ের শব্দ শুনলে সে 'লেটার' বানানে পরপর চারটে 'টি' লিখে বসে।

বাদামটা গলায় আটকে যেতে গোটা তিনেক বিষম খেল একসঙ্গে।

স্ত্রী নিবিষ্ট মনে ট্রাপিজের খেলা দেখছিল। বিরক্ত হয়ে বললে, "কী হল তোমার? অমন করছ কেন?"

কোনমতে বাদামটা গিলে ফেলে সে বলল, "আমাদের ছোটসাহেব!"

"তার জন্যে বিষম খাচ্ছ কেন?" স্ত্রীর কপালে ভ্রুকুটি ঘনিয়ে এল।

"মানে, ওই যে সামনের চেয়ারে বসে আছে কিনা! ওই যে টাক—ছাই রঙের ওভারকোট—"

"তাতে তুমি ভয়ে মরে যাচ্ছ কেন ?" স্ত্রীর আরো বিরক্ত হল : "এটাও তোমার অফিস নাকি ?"

"না, ঠিক অফিস নয়, তবে—মানে একটু আগে আমি বিড়ি খাচ্ছিলাম কিনা—"

"খাচ্ছিলে তো খাচ্ছিলে, তার জন্যে কি তোমার মাথা কেটে নেবে নাকি ?" স্ত্রীর বিরক্তি এবার ঘৃণায় আরো কটু হয়ে উঠল, "অনেক পুরুষ মানুষ দেখেছি, কিন্তু তোমার মত ভিতু আর অপদার্থ আমি কখনো দেখিনি।"

সেই পুরনো কথা। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে। মলয়দার সেই অতিকায় চড়গুলো। খুড়িমার ঝঙ্কার। স্কুলে গাধার টুপি পরে দাঁড়িয়ে থাকা। অফিসে সকলে মিলে তাকে এপ্রিল-ফুল করা। মাইনে পেয়ে টুপ্ করে পালিয়ে আসবার সময় অফিসের দারোয়ানের সেই পিছন থেকে কলার টেনে ধরা : কাঁহা ভাগতে হেঁ বাবু ? আগে হামারা রূপেয়া নিকাল দিজিয়ে—

সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়ে বিয়ের দিনের কথা। মেয়েদের পাল্লায় পড়ে পুরো দশ মিনিট সে ভ্যা-ভ্যা করে ডেকেছিল। তাই শুনে তার এক বড় শালী বলেছিল, "এ যে দেখছি সত্যিই ভেড়া—পুরুষ মানুষ নয়! আমাদের টুনি অবশ্য শক্ত মেয়ে—ভালো করেই চরাতে পারবে একে।"

ওটা এখন আর গায়ে লাগে না—বরং শুনতে শুনতে বোধ হয় ভালোই লাগে মধ্যে মধ্যে। ভারী নির্ভাবনা আছে ভীরুতার মধ্যে। তার কাছ থেকে কেউ আর এখন কিছু আশা করে না। তাকে এপ্রিল-ফুল করে করে অফিসের বন্ধুরা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছে। যে ছোটসাহেব কথায় কথায় চাকরি খাওয়ার যম, সে-ও তাকে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম হলেও স্ত্রী তাকে ডাকে না—সেই সময়েও সে নিশ্চিন্ত হয়ে

দাতন করে, নয়তো একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে নিবিষ্ট মনে কান চুলকোতে থাকে।

গাল খেয়েও তাই চুপ করেই রইল। কিন্তু মনটা ছটফট করছে। মাথার উপর ট্রাপিজের সর্বনাশা দোল। পাশে স্ত্রীর কপালে ভ্রূকুটিটা থমকে আছে তখনো। সামনে ওই টাকের মালিক তার ছোটসাহেব। ইচ্ছে করছিল, উঠে এক সময় বেরিয়ে যায় সুট করে—কিন্তু পাছে ছোটসাহেব পুরোপুরি দেখতে পান তাকে, এই ভয়ে যেখানে বসেছিল, সেইখানেই রইল একেবারে কাঠ হয়ে।

এমন সময় এল সেই সর্বশেষ খেলা। সিংহের খেলা।

বড় বড় খাঁচার মধ্য থেকে ঘন বাদামী রঙের জানোয়ারগুলো একটার পর একটা লাফিয়ে পড়তে লাগল প্রকাণ্ড লোহার বেড়ার ভিতরে। সমস্ত ভয় আর অস্বস্তি ভুলে গিয়ে তার সর্বাঙ্গে হঠাৎ রোমাঞ্চ জেগে উঠল—কী যেন শির শির করতে লাগল বুকের মধ্যে। বাদামী জানোয়ারগুলোর সুদীর্ঘ মসৃণ শরীরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন ঘোর-ঘোর লাগতে লাগল যেন!

"চমৎকার!" হঠাৎ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

"কি চমৎকার? চ্যাঁচাচ্ছ কেন অমন করে?" স্ত্রী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল।

"এই সিংহগুলো—" চুপসে গিয়ে জবাব দিল সে।

"চমৎকার সে তো দেখাই যাচ্ছে। তাই বলে চ্যাঁচাচ্ছ কেন তুমি?"

তা বটে—চ্যাঁচানোটা ঠিক হয়নি। হয়তো ছোটসাহেব শুনতে পাবেন এখুনি। কিন্তু কেন কে জানে, একটা আশ্চর্য উত্তেজনায় মনটা ভরে উঠছে তার। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে—কী একটা হতে যাচ্ছে, কী একটা হতে পারে—এমনি চাপা সম্ভাবনায় ঝিনঝিন করছে রক্ত।

পকেটে হাত দিয়ে বিড়ি বের করতে গেল, কিন্তু ছোটসাহেবের টাকটা চোখে পড়তেই পকেটের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল হাত। আর সেই সময়ে সবচাইতে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। শেষ সিংহটা বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে।

হ্যাঁ—একেই বলে সিংহ। সঙ্গে সঙ্গে বাকীগুলো একেবারেই ম্লান হয়ে গেল। বোঝা গেল, ওগুলো সিংহী—সাধারণ—নিতান্তই সাধারণ। আর এতক্ষণে যে এসেছে সে হল রাজরাজেশ্বর—ওরা তার নগণ্য রানীর দল।

বিরাট মাথার উপর বিশাল কেশরের রাশ ফুলিয়ে এসে দাঁড়াল জানোয়ারটা। ছোট ছোট কাঠের চৌপাইয়ের ওপর সিংহীরা শান্তশিষ্টভাবে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মধ্যে মধ্যে হাই তোলবার মতো করে বিরক্তি জানাচ্ছে কেউ কেউ। মাঝখানের বড় টুলটা খালি আছে এখনো—সেইটে রাজার সিংহাসন।

কালো জামার উপর রুপোর মেডেলের মালা-পরা রিং-মাস্টারের হাতে প্রকাণ্ড চাবুকটা শাঁই শাঁই করে উঠল। বেঁটে রোগা মানুষটা নিজের রক্তের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি শুনল তার। পকেট থেকে মুঠোটা বেরিয়ে এল—আঙুলগুলো সমানে কেঁপে চলেছে তার।

সিংহ গর্জন করে উঠল। সার্কাসের গোটা তাঁবুটা গম গম করে উঠল সে-শব্দে। রিং-মাস্টারের চাবুক শাঁই করে উঠে চটাস্ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। মাঝখানের বড় টুলটার উপরে প্রায় পা রাখতে যাচ্ছিল সিংহটা—আচমকা ঘুরে তাকাল রিং-মাস্টারের দিকে।

স্ত্রীর কথা ভুলে গিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের ভিতর থেকে একটা বিচিত্র বন্য উদ্দামতা ঠেলে ঠেলে উঠছে—যেমন করে মুখখোলা সোডার বোতল থেকে ফেনা উপচে উঠতে থাকে। কী একটা হতে চলেছে—কী একটা হয়ে যাবে এখুনি।

স্ত্রী বললে, "ও কী হচ্ছে! আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? বোসো শিগগির—"

হয়তো বসেই পড়ত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার গর্জন করে উঠল সিংহটা। আগের চাইতে আরো জোরে—আরো ক্রুদ্ধ উগ্র পর্দায়। মনে হল, ও যদি আর একবার তখুনি গর্জন করে ওঠে, তা হলে থরথর করে কেঁপে-ওঠা তাঁবুটা আর তা সইতে পারবে না—একটা বেলুনের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

তারপরে যা ঘটল, তার উপরে এই বেঁটে রোগা লোকটার কোনো হাত ছিল না। সমস্ত ভুলে গিয়ে সে এগোল সামনের দিকে, লাফিয়ে পার হল ছোট্ট উঁচু জায়গাটা একেবারে ছোট-সাহেবের চোখের সামনে দিয়ে, পরক্ষণেই তাঁবুশুদ্ধ লোকের উৎকট চিৎকারের মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে গেল লোহার বেড়াটার কাছে। আর বেড়ার গায়ে সারা শরীরটাকে চেপে তুহাতে মুঠো করে ধরল সিংহের কেশর—যেন তা থেকে খানিকটা সে টেনে ছিঁড়ে নিতে চায়!

পলকের ভিতর প্রলয় ঘটে গেল। ফিরে দাঁড়াল সিংহ—মলয়দার চড়ের চাইতেও লক্ষ গুণ জোরালো একটা থাবা এসে পড়ল। তার খানিকটা লাগল লোহার বেড়ায়—খানিকটা লাগল তার মুখে। আবার সিংহের গর্জন উঠল তার সঙ্গে—মনে হল, এবার সত্যিই এই বিরাট তাঁবুটা একটা ফাটা-বেলুনের মত মিলিয়ে গেল শূন্যে।......

...ডাক্তার বললেন, "পাল্‌স ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কিছুই করবার নেই আর।"

লোকটা কিন্তু অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল তখন। আফ্রিকার কালো জঙ্গলে সে তীর-ধনুক নিয়ে সিংহ শিকার করছে। একটা—তুটো—তিনটে—চারটে—আরো অনেকগুলো। প্রথমটার মুখ ঠিক মলয়দার মতো। বাকীগুলোকে খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

চায়ের বিকেলে

মনোজ খুশী হয়ে বললে, "আরে, এসো, এসো। ব্যাপার কী ?"

"ব্যাপার কিছু নয়—" ধপ করে একটা চেয়ারের উপর প্রায় আছড়ে পড়ল অমিতাভ। একবার তাকিয়ে দেখল উপরের দিকে। পাখাটা ঘুরছে, পুরোদমেই ঘুরছে। তবু পাঞ্জাবির ছুটো বোতাম খুলে দিলে অমিতাভ, ঘামে স্যাঁতসেঁতে রুমালটাকে কপালের উপর বুলিয়ে নিলে আর একবার।

তারপর বললে, "এমন সুন্দর বিকেলটা, ভারী ইচ্ছে হল কোথাও গিয়ে জমিয়ে বসে চা খাই, আড্ডা দিই ঘণ্টাখানেক। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল তোমার কথা।"

"বলছি চায়ের কথা—" মনোজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল।

"আরে বোস না, ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?"—অমিতাভ আয়েস করে পা ছুখানাকে টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিলে, "চা খেতেই তো এসেছি, না খেয়ে কী আর উঠব ? সে হবে ধীরে-সুস্থে। তোমার কোথাও তাড়া আছে নাকি বেরুবার ?"

মনোজ ক্ষীণ রেখায় হাসল, "না, সহজে আমি কোথাও বেরুই না।"

"সে তো জানিই।"—টেবিল থেকে মনোজের সিগারেটের প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিতে নিতে অমিতাভ বললে, "অফিসে নিতান্ত যেতে হয় বলেই যাও। ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি-মুখো। সত্যি বলছি মনোজ, তোমাকে আমার হিংসে হয়।"

"হিংসে !"

"তা ছাড়া কী?"—ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিতাভ বললে, "এই দশ বছর বিয়ে করেছি, ঘরের সুখ পেলামই না বলতে গেলে। মেসে মেসেই জীবনটা কাটল। শনিবার বাড়ি পৌঁছুতে রাত দশটা, আর সোমবার ভোরের আলো ফুটবার আগেই স্টেশনের দিকে দৌড়! স্ত্রীর সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করে পরিচয়ই হয়েছে কিনা সন্দেহ!"

মনোজ আবার উঠে দাঁড়াল। বললে, "চায়ের কথাটা আগে বলে আসি কেতকীকে। গল্প করা যাবে তারপর।"— বাঁ পাশের দরজাটার ছিটের পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হল মনোজ।

সিগারেটের ধোঁয়া উপর দিকে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে অমিতাভ একবার দেখল পাখাটার ঘূর্ণি। সেখান থেকে চোখ সরে এল দেওয়ালের খান-কয়েক বাছাই করা ছবির দিকে। মনোজ আর কেতকীর একখানা বিয়ের ফোটো—এন্‌লার্জ করে বাঁধানো হয়েছে। একটা ভোঁতা তৃপ্তিতে কেমন বোকা-বোকা দেখাচ্ছে মনোজের মুখখানা। রথের পুতুল দিয়ে সাজানো একটা কাচের আলমারি। রঙিন পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলছে—একটা মৃদু চঞ্চল আলোর ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

হিংসে। নিঃসন্দেহ। ঠিক এক্ষুনি যে বিমর্ষ বিকেল নেমে এসেছে বাইরে, এই ঘরে বসে তাকে ভুলে যাওয়া চলে; ভুলে যাওয়া যায়, অফিস-ফিরতি মানুষের কাঁধ এখন দুদিকে বাঁকের মতো নুয়ে পড়েছে, ট্রামের চাকাগুলো পর্যন্ত জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে ক্লান্তিতে। সারাদিন জীবন-মন্থনের পর কলকাতার সহস্র ফণায় এখন ছড়িয়ে পড়ছে কালকূট, কার্বন-মাখানো হাওয়ায় এখন ছায়া-ছায়া মৃত্যুর আভাস। অথচ এই ঘর এখন চা খাওয়ার একটি মিষ্টি বিরাম দিয়ে ঘেরা। মনোজ আর কেতকী। কেতকী আর মনোজ। এই ঘরে এসে বসলে মনে হয়, অনেক দিন বাঁচা চলে, অনেক দিন বাঁচা উচিত।

এখানে না এলে সময়টা কীভাবে কাটাত অমিতাভ? মোহন-বাগানের ম্যাচ দেখতে গিয়ে খানিকক্ষণ গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচানো। ফিলিম দেখতে গিয়ে খানিক নাকি কান্নার বিলাস, নইলে সুড়সুড়ি খাওয়া একপ্রস্থ ছোঁয়াচে হাসি। হাতের ঘামে ভিজে ভিজে ময়লা তাস নিয়ে নির্বোধ উত্তেজনা। আর নতুবা পাশাপাশি উবু হয়ে বিড়ি টানতে টানতে আর একজনের সঙ্গে দুঃখের জাবর কাটা।

মনোজ আর কেতকী। কেতকী আর মনোজ। সামনের টেবিলে কাচের ফুলদানীতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা সাজানো থাকলেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়ে যেত। অমিতাভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পাশাপাশি টেবিলে চাকরি, একই মাইনে। অথচ মনোজের বরাতখানা দ্যাখো একবার। বাপ-মা ভাই-বোন কেউ আছে কি না সন্দেহ, থাকলেও দুজনের এই দুটি ছোট্ট ঘরে এসে উপদ্রব করতে তাদের দেখা যায়নি। মনোজের যা মাইনে, তাতে এই দু'খানি ঘরের ভাড়া দিয়েও খুশি হয়ে বাঁচার মতো উদ্বৃত্ত থাকে, এমন কি সপ্তাহে দু' ডজন রজনীগন্ধা পর্যন্ত কেনা যেতে পারে। আর অমিতাভ? কলকাতায় বাসা নেবার কল্পনা করে দেখা যাক একবার। মা-বাবা তো আছেনই, ফাউ আসবেন বিধবা পিসীমা, স্ত্রী, তিন চারটে ছেলেমেয়ে, এমন কি বুড়ী ঝিটাও যদি আসতে চায়—তাকেই বা ঠেকাবে কে?

তখন, এমনি একটা চায়ের বিকেলে, এই রকম আলোর ঢেউ-লাগা একখানা ঘরের কথা ভাবাও চলবে না। হয়তো বাবার জন্যে কিনতে হবে তামাক, বিকেলের বাজারে খুঁজতে হবে সস্তার শাক-মাছ, এতগুলো লোকের পেটের জোগাড় করার জন্যে নিতে হবে গোটা দুই টিউশন। এমন একটা চায়ের বিকেল তার জীবনে কখনো আসবে না, কোনদিনই না।

অথচ বরাত একবার দ্যাখো মনোজের। দেওয়ালের বিয়ের ফোটোতে মনোজের বোকা-বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভর

মনে হতে লাগল, অনেক—অনেক বেশী পেয়েছে মনোজ। এত বেশি করে পাওয়ার ওর কোনো দরকার ছিল না।

পর্দা সরিয়ে মনোজ ফিরে এল।

ফর্সা একটা নতুন গেঞ্জি পরে এসেছে—কেতকীই বদলে দিয়েছে নিশ্চয়। এর মধ্যে আর একবার দাড়িও কামিয়ে এল নাকি? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো ধপধ'প গেঞ্জিটার জন্যেই অত চকচকে দেখাচ্ছে মুখখানা। পাঞ্জাবির তলায় একটা বীভৎস শীতল আলিঙ্গন অনুভব করল অমিতাভ। তার ঘামে ভেজা ময়লা গেঞ্জিটা—পিঠের ছেঁড়া জায়গাটা কেমন সির-সির করছে।

মনোজ বললে, "চা আনছে কেতকী। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসবে।"

"আসুন না, পাঁচ মিনিট না হোক, পনেরো মিনিট পরেই তিনি আসুন। আমার তাড়া নেই।"—চায়ের বিকেলের আমেজ লাগা এই ঘরখানাকে সমস্ত স্নায়ুগুলো দিয়ে অনুভব করতে করতে জবাব দিলে অমিতাভ। কোথা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধও আসছে যেন। মনোজ কি ক্রীমও মেখে এল নাকি?

অমিতাভর মুখোমুখি বসে পড়ল মনোজ।

"আজ খেলা দেখতে গেলে না?"

"নাঃ, ভালো লাগল না।"

"ভালো লাগল না—বলো কী!"—কৌতূহলহীন বিস্ময়ে মনোজের চোখের কোনা দুটো ছড়িয়ে পড়ল একবার: "খেলার মাঠে তো রোজ তোমার গঙ্গাস্নান হে।"

"না, ক্লান্ত হয়ে উঠেছি।"

"তাসের আড্ডা?"

"সবশুদ্ধ বায়ান্ন খানার বেশি তাস নেই," অমিতাভকে দার্শনিকের মতো মনে হতে লাগল, এবং "জি-এস্-এর বেশি আর কিছুই করবার নেই ওতে।"

"কী হয়েছে তোমার অমিতাভ? বাড়ির চিঠিপত্র পাওনি নাকি?"

"চিঠিপত্র?"—এবার অমিতাভর মুখে সিনিক হাসি দেখা দিল: "অফিস থেকে ফিরেই গিন্নীর পোস্টকার্ড পেয়েছি একখানা। তাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর, ছোট ছেলেটার হাম হয়েছে।"

"চিন্তার কথা তা হলে।" —অগত্যা মনোজ চিন্তিত হতে চেষ্টা করল।

"বাচ্চা ছেলের হাম হবে, এতে চিন্তিত হওয়ার কী থাকতে পারে?"—অমিতাভ একটা মুখভঙ্গি করল, "এতদিন হয়নি কেন সেইটেই বরং চিন্তার কথা।"

মনোজ এবারে আর কথা খুঁজে পেল না। দেওয়ালের এন্‌লার্জ করা ফোটোটার মতই নির্বোধ মুখে তাকিয়ে রইল। অমিতাভকে তার দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে পা দুটোকে কখন গুটিয়ে এনেছিল, আবার তাদের টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিলে অমিতাভ, যেন একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রামে এলিয়ে দিতে চাইল নিজেকেও। বাইরে নিশ্চয় সূর্য ডুবে যাচ্ছে এখন—আকাশে কালকূটের মতো সন্ধ্যা। ট্রামের চাকাগুলো অসহ্য ক্লান্তিতে লাইনের মধ্যেই কর্ণের রথচক্রের মতো বসে যেতে চাইছে। রঙিন পর্দা থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোর ঢেউ এই ঘরের মধ্যে যখন ক্রীমের গন্ধে ধূপের ধোঁয়ার মতো রঙ ধরছে, তখন বাইরের পৃথিবীতে একটা ছেঁড়া কালো কম্বলের মতো দম-আটকানো রাত্রি সঞ্চারিত হয়ে পড়ছে।

খুট করে সুইচের আওয়াজ হল, ওয়াটার-লিলির মতো ফুটে উঠল ঘরখানা। মনোজ আলো জ্বেলে দিয়েছে। একটি চায়ের বিকেল সন্ধ্যার খুশিতে ঘন হয়ে উঠল।

হঠাৎ কথা কইল মনোজ। পরামর্শ করার মতো ফিস্‌ফিসে গলায়।

"তোমার সঙ্গে খেলা দেখতে যাব একদিন। গড়ের মাঠে।"

মনের উপর একটা রেশমী আমেজ বুনছিল অমিতাভ, হঠাৎ যেন ছুরির খোঁচা লাগল তাতে।

"বলো কি, তুমি যাবে খেলার মাঠে? নড়তে পারবে স্ত্রীকে ছেড়ে?"—এর পরেই বেশ একটা জমানো অট্টহাসি হাসবার জন্যে মনে মনে ঘন হয়ে বসল অমিতাভ।

"কেন পারবো না?" —মনোজের ফিস্‌ফিসে গলায় এবার মিনতির সুর বাজতে লাগল: "একটা হিন্দি-টিন্দি গোছের ফিল্ম দেখতে হবে একদিন। নিয়ে যাবে?"

"বেশ ঠাট্টা করছ যা হোক!" —পরিকল্পিত অট্টহাসিটাকে এইবারে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় কি না, অমিতাভ সেটা ঠিক করবার আগেই আর একবার পর্দা সরল। চায়ের ট্রে নিয়ে কেতকী ঢুকল।

অট্টহাসিটা থমকে গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস কাত্‌রে উঠল বুকের মধ্যে। আহা—এই তো জীবন! এর বেশি চাইবার নেই, এর বেশি পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না অমিতাভ। সদ্য-স্নান-করা এলো চুল পড়েছে পিঠ ছেয়ে, ঘরের আলোটাই যেন বাসন্তী রঙের শাড়িতে লীলায়িত। দুটি ভ্রুর ঠিক মাঝখানে ক্ষীণতম কুঙ্কুমের বিন্দু, চোখের কোণের কাজলরেখায় স্বপ্নমাখানো বিশ্রাম ঘনিয়ে রয়েছে। কেতকীই বটে!

আর মেসে? ডালে টিয়ার-গ্যাস মার্কা সম্বরার ঝাঁজ। চৌবাচ্চার আশেপাশে এর মধ্যেই ধেড়ে ইঁদুরের আসা-যাওয়া। তেতলার ঘরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা সস্তা হারমোনিয়ামের সঙ্গে গোলাম আলী খাঁকে মুখ-ভ্যাংচানি!

ক্রীমের গন্ধটাকে ঢেকে দিয়ে কেতকীর প্রসাধনের সুরভি। কেতকীর স্বরও সেই গন্ধ দিয়ে মাখানো।

"কখন এলেন অমিতাভবাবু? ভালো আছেন তো?"

"আমাদের আর থাকা!"—বানপ্রস্থের হাসি হাসল অমিতাভ, "চলে যাচ্ছে একরকম।"

"বাড়ির খবর ভালো?"—সামনে চায়ের পেয়ালা, পুরু মাখন মাখানো টোস্ট আর মসৃণ শীতলপাটির মতো অম্‌লেট এগিয়ে দিতে দিতে আর একবার সুরভিত প্রশ্ন কেতকীর।

বাড়ি? মুহূর্তে মন হিংস্র হয়ে উঠল অমিতাভর। মেসের রান্নাঘর থেকে ডাল-সম্বরার গন্ধ যদি-বা সহ্য করা যায়—বাড়ি! যেখানে ময়লা শাড়িতে কয়লা ভাঙার কালো ছোপ মাখিয়ে এখন খস্ খস্ করে হলুদ বাটছে তার স্ত্রী? যেখানে বাচ্চাদের চিৎকারে—

চটে গিয়ে কড়মড় করে টোস্টে একটা কামড় বসাল অমিতাভ, "খারাপ থাকবে কেন? খারাপ থাকবার কোনো কারণই নেই তাদের।"

এতক্ষণ কোথায় যেন তলিয়ে ছিল মনোজ। হঠাৎ গোটাকয়েক ক্ষীণ বুদ্‌বুদ নিয়ে ভেসে উঠল।

"ওর ছোট বাচ্চাটার হাম হয়েছে বলছিল।"

ইডিয়ট! তীব্র দৃষ্টিতে একবার মনোজের দিকে তাকাতে গেল অমিতাভ। কিন্তু চামচের মাথায় তখন অম্‌লেট কাটতে হচ্ছে, পিছলে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব প্লেট আর চামচের একটা ঠুন্ করা জোরালো আওয়াজের মধ্য দিয়েই মনের জ্বালা দমাতে হল অমিতাভকে। এমন একটা বিশ্রী বেসুরো কথা ঠিক এই মুহূর্তেই কি না-বললে চলছিল না মনোজের?

কেতকীও নিশ্চয় মনোজের মতোই চিন্তিত হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর সময় দিল না অমিতাভ। অম্‌লেটের টুকরোটাকে না চিবিয়েই পট্ করে গিলে ফেলল। অদ্ভুত জান্তব-গলায় বললে, "না—না, ও কিছু না। ভালো হয়ে গেছে।"

"ভালো হয়ে গেছে?"—মনোজ চকিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল,

কিন্তু এবার ঠিক তাক বুঝে বজ্রদৃষ্টি ফেলল অমিতাভ। মনোজ থমকে গেল।

"তবু রক্ষে।" কথাটার জের যেন থামতে দিতে চায় না কেতকী: "ছেলেপুলের হাম হওয়া ভারী বিশ্রী!"

"বিশ্রী বলে বিশ্রী।" —আর একটা টোস্ট তুলে নিতে নিতে কথাটা ঘুরিয়ে দিলে অমিতাভ: "আপনারা দিব্যি আছেন। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই!"

"তা নেই বটে!" —কেতকী অল্প একটু হাসল: "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অমিতাভবাবু?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"অফিসে বুঝি ওভারটাইম আজকাল প্রায়ই পড়ছে আপনাদের ?"

কী কথা থেকে কোথায়! মুখের সামনে টোস্টটা থমকে দাঁড়াল: "তা পড়ে। কিন্তু কেন বলুন তো ?"

"আপনার বন্ধু সব সময়েই বলেন কিনা সে-কথা! আচ্ছা,"— কেতকীর কাজলটানা চোখ দুটো একবার মনোজের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এল: "আপনাদের অফিসে লেডি এমপ্লয়ি নেই ?"

টোস্টটা নেমে এসেছে প্লেটের উপর, তবু হাঁ করেই রইল অমিতাভ: "তা আছে দু' একজন।"

"মানে বেশ কয়েকজন তো ?"—কেতকী মোহিনী হাসি হাসতে লাগল: "তারাও নিশ্চয় ওভারটাইম খাটে ? যখন লোকজন খুব কম থাকে—অফিস প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, তখনো ? আপনার বন্ধু কিন্তু অস্বীকার করেন। বলেন, মেয়েরা চারটের পরে কেউ-ই অফিসে থাকে না!"

কথা নেই—বার্তা নেই, বাইরের নোংরা আকাশটা ঘরের মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল! যেন একটা ভালুক এসে থাবা দিয়েছে

মুখে। একবার মনোজের দিকে তাকিয়ে দেখল অমিতাভ, মনে হল পৃথিবী থেকে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে তার চেহারা।

মাই গড্! শেষ পর্যন্ত মনোজ। মেয়েরা দূরে থাক, সারা অফিসে কারো সঙ্গেই যে ভালো করে মুখ তুলে কথা কয় না? চায়ের পেয়ালাটা ছুঁয়েই হাত সরিয়ে নিলে অমিতাভ। গরম—অস্বাভাবিক গরম!

চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল অমিতাভ।

"চারটে কেন, তিনটের আগেই ছুটি হয়ে যায় মেয়েদের। আচ্ছা, চলি আজ—"

"ওকি, চা খেলেন না?"—কেতকী চমকে উঠল।

"মাপ করবেন, আজ সময় নেই। একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে—"

প্রায় ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল অমিতাভ। সর্বনাশ—কী সর্বনাশ! কাকে ঈর্ষ্যা করছিল সে? কোথায় সে কাটাতে চাইছিল চায়ের বিকেল? একটা ছেঁড়া কম্বলে চাপা পড়ে খানিক তবু বা বেঁচে থাকা চলে—কিন্তু ওটা যে জাঁতিকল! কোথায় আছে মনোজ?

এর চাইতে ঢের ভালো কাফে-ডি-অ্যারিস্টোর নোংরা কাপের দুর্গন্ধ চা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল অমিতাভ। হিন্দি-টিন্দি যে-কোনো একটা ছবিতে ঢুকে পড়বার মতো পনেরো মিনিট সময় হাতে আছে এখনো।

গালে অনেকক্ষণ ধরে বুরুশ ঘষবার পর, যখন সমস্ত মুখের উপর শাদা ফেনাগুলো ফুলের মত ফুলে উঠল, বেশ মুগ্ধভাবে সেই সফেন শ্রী দেখতে দেখতে, ক্ষুরে ব্লেড পরাতে গিয়ে হিরণ্য সোম হঠাৎ ভয়ানকভাবে দমে গেল।

চারদিন আগেই মনে হয়েছিল আর চলছে না। চারদিন আগেই মনে হচ্ছিল গালের উপর দাড়িগুলো করকর শব্দে প্রতিবাদ করছে। এক বন্ধুর পরামর্শে কাচের গ্লাসে ঘষে আরও দুদিন কোনোমতে কাটল। মুখ মসৃণ হল না—একটা খরখরে ভাব থেকেই গেল। আজ একেবারে অসম্ভব।

হিরণ্য সোম ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা নটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্নান করতে যেতে হবে। যেমন করে হোক, সাড়ে নটার ট্রেনটা ধরাই চাই। এর মধ্যে ব্লেড কিনতে গেলে আরও অন্তত সাত মিনিট বরবাদ। সে-সময় হাতে নেই হিরণ্য সোমের।

ইস্—কিছুতেই মনে পড়ল না কাল। সকালে যখন বাজারে গিয়েছিল, তখনও তার বার বার অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল, কী যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে—কী যেন অত্যন্ত দরকারী জিনিস একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্লেডটাই বাদ পড়ে যাবে—এমন একটা সর্বনেশে ভুলই ঘটে বসবে, হিরণ্য সোম তা কল্পনাও করেনি।

ক্ষুরখানা হাতে নিয়ে মিনিট দেড়েক সে শোকাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বিলাপের সময় নেই—সাড়ে নটার ট্রেনটা এক মিনিটও লেট করে না। অতএব যা থাকে কপালে—সাবানের ফেনার মধ্যে সে ক্ষুর বসিয়ে দিলে।

বিকৃত মুখে হিরণ্য সোম কামাতে চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষুর নয়—গালের উপর দিয়ে যেন করাত চলছে। ব্লেডটাকে যতখানি সম্ভব চেপে ধরে সে টেনে চলল, আর সেই সঙ্গে শুনতে লাগল খরখর করে বিদ্রোহী দাড়ির আর্তনাদ।

হিরণ্য সোম বরাবরই ঝকঝকে, তকতকে, ফিটফাট। কলেজে, য়ুনিভারর্সিটিতে, অফিসে এজন্যে চিরকাল সে বন্ধুদের ঈর্ষ্যাভাজন হয়েছে। যেমন বেশ-বাসে, কথায়-কাজেও তেমনি। কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী সহপাঠিনীর সঙ্গে সে-ই আলাপ জমিয়েছে সবচেয়ে আগে, মেয়েদের বিস্ময় এবং কৌতুক আকর্ষণ করে সে-ই নিরীহ অধ্যাপককে সব চাইতে বেশি বিব্রত করেছে, আধুনিক ইংরেজী কবিতার নতুন বইটি সর্বপ্রথম তারই হাতে দেখা গেছে, সভা-সমিতিতে সে-ই নিয়েছে উদ্যোক্তা এবং ধন্যবাদদাতার ভূমিকা। অবশ্য লেখাপড়ায় কোনদিন খুব ভালো করেনি, কিন্তু তার মতো ব্রাইট, বুদ্ধিমান ছেলেরা সিরিয়াসলি অ্যাক্লাডেমিক হওয়াটাকে চিরকালই অবজ্ঞা করে থাকে।

পৃথিবীতে যারা সত্যিকারের প্রতিভা, তারা কখনও যোগ্য স্থান পায় না। হিরণ্য সোমও পায়নি। যার 'অ্যামব্যাসাডর' হওয়া উচিত ছিল, সে এখন একশ আশি টাকা মাইনের চাকরি করে—সাড়ে নটার ট্রেন ধরবার জন্যে তাকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়। অবশ্য সেজন্যে হিরণ্য সোমের দুঃখ নেই। যুগটাই মিডিয়োক্রিটির। প্রতিভাবানেরা এ যুগে উপেক্ষিত হবে—এ তো য়ুনিভার্সাল ট্র্যাজেডি।

নইলে হিরণ্য সোম—কলেজে, য়ুনিভার্সিটিতে সেরা মেয়েদের সঙ্গে যে ঘুরে বেড়াত, যার দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের ঈর্ষ্যার অবধি থাকত না—সে শেষ পর্যন্ত বাবার পাল্লায় পড়ে এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করল, যার এক পাতা চিঠিতে বারোটা বানান ভুল! তার এমন স্ত্রী জুটল—যাকে হিউমার করবার পরে ব্যাখ্যা করে

বোঝাতে হয় যে, এ-কথায় তোমার হাসা উচিত! তবুও হিরণ্য সোমের ক্ষোভ নেই। *প্রতিভাবানদের এ-যুগে এইভাবেই* আত্মত্যাগ করতে হয়।

ধারালো, ঝকঝকে হিরণ্য সোম দাড়ি কামান শেষ করল ভোঁতা ব্লেড দিয়ে। একদম পরিষ্কার হল না—সমস্ত গলাটায় যেন বালির দানা ছড়ান রয়েছে—এমনি মনে হয়। হিরণ্য ভুরু কোঁচকাল। থুত্নিটার জন্যেই সবচেয়ে অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। ওইখানেই প্রত্যেক দিন সকালে পাউডারের বিন্দুর মতো কয়েকটি পাকা দাড়ি ফুটে উঠে মনে করিয়ে দেয় তার বয়স চল্লিশ ধরো-ধরো। যৌবনের কাছ থেকে ফেয়ারওয়েল। হিরণ্য তবু এত সহজেই হার মানতে চায় না। ধারালো ব্লেড দিয়ে প্রতিদিন ওই জায়গাটিকেই সে তৈল-মসৃণ করে রাখে। ঝকঝকে, ফিটফাট ব্রাইট হিরণ্য সোম এত তাড়াতাড়ি তার তারুণ্যকে বিদায় করে দিতে রাজী নয়—আরো বিশেষ করে অফিসের নতুন সহকর্মী কুমারী শিখা ঘোষ আসবার পর।

আরও কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল সে। বোঝা যাচ্ছে? বোধ হয় না। নাকি ভালো করে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যেতে পারে?

কিন্তু পর্যবেক্ষণেরও সময় নেই আর। সাড়ে নটার ট্রেনটা এক মিনিটও লেট করে না।

চলতি ট্রেনের কামরায় বসে অস্বস্তিটা আরও বেড়ে উঠল। দুজন চাষী শ্রেণীর মানুষ আর খবরের কাগজে তন্ময় হয়ে থাকা মাস্টারী চেহারার একজন বুড়ো ভদ্রলোক ছাড়া প্রত্যেকটি লোকই পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে এসেছে। নিপুণ, নিখুঁত, মসৃণ। এমন কি, একটু আগেই যে-লোকটা টফি-লজেন্স-ডালমুট ফিরি করে গেল সে-ও। শুধু সব চাইতে পরিচ্ছন্ন—সব চাইতে উজ্জ্বল হিরণ্য সোমই আজ সবচেয়ে ম্লান হয়ে আছে। স্নো-পাউডারের প্রসাধন ভেদ করেও হয়ত মুখে কৃষ্ণাভা ফুটে বেরুচ্ছে তার—

গাড়িভরা এই উজ্জ্বল আলোয় থুতনির নীচে কী যে ঘটে বসে আছে কে জানে।

হিরণ্য গাড়ির ভিতরে আর তাকাতে পারল না। পরাভূত লজ্জিত মন নিয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলে দিলে।

প্রত্যেক দিনের সেই পরিচিত চেনা লাইন দিয়েই ট্রেন চলেছে। টেলিগ্রাফের পোস্ট থেকে প্রত্যেকটা গাছ, প্রত্যেকটা জলা, এমনকি, ফণী-মনসার ঝোপে আজ দু মাস ধরে আটকে থাকা ক্রমে লাল হয়ে আসা খানিকটা তালপাকানো খবরের কাগজ—সব চেনা। তবু কিছুদিন ধরে এই পথটাই বেশ মনোরম হয়ে উঠেছিল। শিমুলের কঙ্কালগুলোতে দেখা দিয়েছিল রক্তমঞ্জরী, সোনালী মুকুলে ভরে গিয়েছিল আমগাছগুলো, নিমফুলের গন্ধ আসছিল এক-এক ঝলক, ভাঁটফুলের ঝোপে বাসন্তী রঙের প্রজাপতি চোখে পড়ছিল। সেই পনের দিন আগে থেকে—নতুন সহকর্মী কুমারী শিখা ঘোষের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে।

আজ যেন সব অন্যরকম। চারদিকটা বড় বেশি জংলা ঠেকতে লাগল—শিমূলের রক্তলাল রঙ যেন রসাভাসের মত মনে হল। তিন-চারটে মোষ একরাশ কাদার মধ্যে চোখ বুজে বসে আছে—একটা মরা কুকুরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে একপাল শকুন। লাইনের ধারে ধারে যে ফণী-মনসার জঙ্গল এত বেশি, এতকাল তা সে খেয়ালই করেনি, রাশি রাশি তীক্ষ্ণধার কাঁটা উদ্যত হয়ে আছে—যেন সাত দিন ওরা পাকা দাড়ি কামায়নি।

হিরণ্য আবার গাড়ির ভিতরে চোখ ফিরিয়ে আনল। পকেট থেকে বার করল নতুন ইংরেজী ডিটেকটিভ বইটা। বিস্বাদ বিরক্তিতে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্তত এই বইটা থেকে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করা যাক।

হিরণ্য পাতা ওল্টাল। সেই পর্যন্ত এসেছিল—যেখানে ক্রিমিন্যাল একটি মেয়েকে খুন করে তার দেহটাকে অ্যাসিডের গামলায়

মধ্যে ফেলে দিতে যাচ্ছে। পাতা দুই পড়তে না পড়তেই বেশ জমে এল। কিন্তু ঠিক এমনি সময়—রিভলবার বাগিয়ে খুনীর পিছনে আর একটি লোকের নিঃশব্দ আবির্ভাব ঘটল। দি ম্যান ইজ টল—ক্লীন শেভেন। ক্লীন শেভেন! হোঁচট খেয়ে থমকে গেল হিরণ্য। মনের ভিতর বেশ ঘন হয়ে জমে উঠতে থাকা রহস্যের কুয়াশাটা মুহূর্তে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য—আশ্চর্য! এতদিন পরে আর একটা নতুন সত্য আবিষ্কার করল হিরণ্য সোম। প্রত্যেকটি বিলিতী গোয়েন্দা কাহিনীতেই খুনী হোক, গোয়েন্দা হোক, অথবা নায়ক হোক,—তাদের প্রায় সকলেই ক্লীন শেভেন। অর্থাৎ ক্লীন শেভ না থাকলে ডিটেকটিভ উপন্যাসই হয় না।

বইটাকে হিরণ্য সবেগে পকেটে পুরে ফেললে। আবার জানালার বাইরে। সারি সারি ফণী-মনসা রেল লাইনের ধার দিয়ে। কবিরা এতকাল মিথ্যে কথা শুনিয়েছে মানুষকে—তিক্তভাবে ঠোঁটে দাঁতের চাপ দিয়ে, ভাবল হিরণ্য সোম। এ শ্যামল কোমল ছায়ার দেশ নয়—ফণী-মনসার দেশ। দিস্ ইজ্ এ ক্যাকটাস ল্যাণ্ড। না-কামানো দাড়ির মত সারি সারি উদ্যত কাঁটা এখানে।

ট্রেন শেয়ালদায় পেঁছান পর্যন্ত নিজের মধ্যে গুম হয়ে রইল হিরণ্য। তারপর প্ল্যাটফর্ম থেকে তার মনে হল একবার একটা সেলুনে ঘুরে গেলে হয় না? পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া চলে না নিজেকে?

কিন্তু সময় নেই। ট্রাম ধরতে হবে এক্ষুনি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় হাজিরা। যার অ্যামব্যাসাডর হওয়া উচিত ছিল, সেই হিরণ্য সোম রুদ্ধশ্বাসে ছুটল সামনের ট্রামটার উদ্দেশে। ওর মধ্যে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে।

দাড়িটা ভাল করে কামান হয়নি বটে, তবে এক দিক থেকে

আজ কপাল ভালো। ওই ভিড়ের মধ্যেই ফস্ করে একটা বসবার জায়গা জুটে গেল।

দু'-চারজন ছাড়া—হ্যাঁ, প্রায় সবাই। ট্রামের যতগুলি মানুষের মুখ হিরণ্য দেখতে পাচ্ছিল, তারা প্রায় সকলেই পরিষ্কারভাবে দাড়ি কামিয়ে এসেছে। নিজের মুখের উপর হিরণ্য হাত বুলিয়ে নিলে একবার। গালটা তবু এক রকম—থুতনিটাই বড় বেশি খরখর করছে। একরাশ মিহি বালির দানা যেন ছড়ান আছে তার উপর। কে জানে, পাউডারের কণার মত পাকা দাড়িগুলোও ফুটে উঠেছে কিনা ওখানে।

অথচ, অনেক স্বপ্ন ছিল আজ। কালকেই কথা কয়ে রেখেছিল মিস শিখা ঘোষের সঙ্গে। অফিসের ছুটির পরে চা খাবে একসঙ্গে। তারপর—যে-কথাটা সে মনে-মনে ভেবে রেখেছিল, অথচ মুখ ফুটে বলেনি—কিছু ফুল সে কিনে দেবে মিস শিখা ঘোষকে। নিউ মার্কেটের কোন্ দোকানে ভাল ফুল কিনতে পাওয়া যায় সে তার জানা।

কিন্তু সব ফিকে, সব বর্ণহীন হয়ে গেছে। ভোঁতা ব্লেডটা দিনের রঙ মুছে দিয়েছে, সন্ধ্যার আলোগুলোকে নিভিয়ে দিয়েছে—একটা তিক্ত পরাভব সৃষ্টি করেছে কোথাও। মরিয়া হয়ে হিরণ্য ভাবতে লাগল, একটা উপায় আছে হয়ত এখনও। টিফিনের সময় এক ফাঁকে গিয়ে বেশ ভাল করে দাড়িটা কামিয়ে আসা। ততক্ষণ—ততক্ষণ পর্যন্ত যথাসাধ্য মিস শিখা ঘোষকে এড়িয়ে গেলেই চলবে। তারপর কামান সেরে, ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে পুলকিত মন নিয়ে, এক ফাঁকে এসে দাঁড়াবে শিখা ঘোষের পাশে, পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলবে, মনে আছে তো বিকেলের কথা ?

শিখা ঘোষ চোখ তুলে তার মসৃণ তারুণ্যদীপ্ত মুখের দিকে তাকাবে। সুন্দর দাঁতের আরও সুন্দর হাসি ছড়িয়ে বলবে, মনে

আছে বইকি। আমি তো ভাবছিলুম, আপনিই ভুলে গেছেন কথাটা।

এতক্ষণের পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণাটা লঘু হতে আরম্ভ করল একটু একটু করে। না—অসম্ভব নয়। এখনও আশা আছে। টিফিনের এক ফাঁকে দাড়িটা কামিয়ে আসার কল্পনা অবাস্তব নয় একেবারে। হিরণ্য আর একবার মুখে হাত বোলাল। চলে যাবে—টিফিন পর্যন্ত চলে যাবে একরকম।

মনের পরাভূত ভাবটা যখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল। ট্রামের রুদ্ধশ্বাস যাত্রীদের মধ্যে ফেটে পড়ল অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন।

"উঃ, এই ভিড়ের ভিতর না উঠলে চলছিল না?"

"ট্রাম-বাস ওদের জন্মে ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে অফিস যাওয়া অভ্যেস করুন মশাই।"

"জ্বালিয়ে মারলে বাবা।"

আর, কণ্ডাক্টার প্রায় হিরণ্যের কানের কাছে মুখ এনে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "লেডীজ সীট ছোড় দিজিয়ে।"

তিক্ত বিরক্তিতে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হিরণ্য। এতক্ষণ ধরে যে-জ্বালাটা জ্বলছিল, হঠাৎ সেটা আত্মপ্রকাশ করে বসল কুশ্রীভাবে। আজ পর্যন্ত যে ধরনের কথা হিরণ্য কখনও বলেনি, ব্রাইট ঝকঝকে মানুষটা যে-জাতের রসিকতাকে চিরকাল কদর্য আর রুচিহীন বলে মনে করেছে, তারই একটা ফসকে পড়ল মুখ থেকে।

"আজকালকার এই সো-কলড্ লেডীরা মশাই......"

বলেই চমকে উঠল হিরণ্য। কথাটার কুৎসিত ভঙ্গি তার নিজেকেই চাবুক মারল। এমন কথা এভাবে সে তো কখনও বলে নি। আজ কেন বলল—কে বলাল তাকে দিয়ে?

আর সেই সঙ্গে হিরণ্য দেখল, মুখ লাল করে, মাথা নিচু করে

লেডীজ সীটটায় বসে পড়ল শিখা ঘোষ। একবার তাকিয়েও দেখল না তার দিকে।

সেই সঙ্গে আরও, আরও অনুভব করল হিরণ্য। ব্লেড আজ সত্যিই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তিলে তিলে ক্ষয়ে গেছে তার ধার—নিভে গেছে তার উজ্জ্বলতা। আর তা কোন কাজেই লাগবে না।

এখনকার বিকেল আর রজনীগন্ধা কিনবার জন্যে নয়। যাওয়ার পথে শেয়ালদা বাজার থেকে এখন সে নিয়মিত কুমড়ো ফুল কিনে নিয়ে যাবে। আর ইলিশ মাছ খেতে খুব ভাল।

কাল রাত্রে হঠাৎ মনে হল, আমি এক্ষুনি মরে যেতে পারি।

বুকে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা—যে যন্ত্রণার সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় ঘটেনি। সমস্ত অনুভূতিটাই এমনি বিজাতীয় যে আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, এ মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। এমন স্বাদ আর কিছুর হতেই পারে না।

লেপের তলায় সারা শরীরটা ঘামে নেয়ে গেছে—ভিজে গেঞ্জিটা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। মাথা না ঘুরিয়েও পাশের টিপয়ের উপর টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার উজ্জ্বল সবুজ বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছি চোখের কোনায়। আলোটা জ্বেলে দিতে চাইলাম, কিন্তু একটা হাতও উঠল না। যেন বিছানার সঙ্গে তাদের পেরেক দিয়ে আটকে রেখেছে কেউ।

সেই অদ্ভুত যন্ত্রণা আস্বাদন করতে করতে, সেই আশ্চর্য নিশ্চেতনার ভিতরে কতক্ষণ পড়ে ছিলাম, ঠিক জানি না। কী ভাবছিলাম অথবা আদৌ কিছু ভাবছিলাম কি না, তাও এখন আর মনে করতে পারছি না। তারপর পাশের বাড়ির ঘড়িতে যখন রাত চারটে বাজল, যখন হঠাৎ এক ঝলক অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হাওয়া জানলার পর্দাটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমার মুখের উপর এসে আছড়ে পড়ল, তখন আমি সোজা বিছানার উপর উঠে বসলাম। যেন জীবন-মৃত্যুর মধ্যে এতক্ষণ ধরে দড়ি টানাটানি চলছিল ; আচমকা মৃত্যুর টানটা ছেড়ে গিয়ে জীবন সবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।

বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা জলের ছাট দিলাম চোখে-মুখে। জল খেলাম এক গ্লাস—একটা ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়ে

জলটা নেমে যাচ্ছে এমনি মনে হল। পেটের ভেতরে খিম্‌চে ধরল একবার। ঘরে ফিরে এসে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালালাম, বসলাম ইজিচেয়ারে।

কেউ বলেনি। তবুও জানি, একটু আগেই আমি মরে যেতে পারতাম। একটু আগেই জীবন-মৃত্যুর যে দড়ি টানাটানি চলছিল, তাতে এ-পক্ষের বদলে ও-পক্ষের জয় হতে পারত অনায়াসেই। আমি কেন বেঁচে আছি তারও যেমন কোনো অর্থ নেই—আমি কেন মরে যাইনি তারও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

টেবিল ল্যাম্পের ফিকে নীল আলোয় ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ওভ্যাল শেপের বড় আয়নাটা ভূতুড়ে চোখের মত তাকিয়ে। শেলফের এলোমেলো বইগুলোকে কোনো প্রকাণ্ড ক্যামেরার দীর্ঘ প্রলম্বিত 'বেলো'র মতো দেখাচ্ছে। খাটের ওপাশে ঘুমন্ত স্ত্রীকে মনে হচ্ছে কোনো দূরগামী ট্রেনের অপরিচিত সহযাত্রীর মত।

আমি মরে গেলে কার কী হত? আমার স্ত্রীর—আমার পরিবারের—আমার পরিজনের? আমি না থাকলে সংসারের কোথায় কতখানি কী লাভ-ক্ষতি হতে পারত? একটু আগেই যদি হঠাৎ—

নিজের মৃত্যু-জল্পনার চট্‌কা ভেঙে গেল ডাক্তার মুখার্জির গলার আওয়াজে।

"আপনার স্ত্রী বেশ ভালোই আছেন মিস্টার ঘোষাল। আপনি মিথ্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।"

আমি লজ্জিত হলাম। মনে পড়ল, এখানে আমি আজ নিজের চিকিৎসার জন্যে আসিনি। এসেছি পূর্ণগর্ভা স্ত্রীকে নিয়ে। এ আমার কাল রাত্রের ঘামে-ভিজে বিছানাটা নয়—এ হল বিখ্যাত 'গাইনো' ডাক্তার মুখার্জির নার্সিং হোম।

কী আশ্চর্য—এতক্ষণ আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম!

আমার মনেই ছিল না—পেছনের প্রকাণ্ড পর্দাটার ওপাশে কোনো একটা ক্যাবিনের খাটে আমার স্ত্রী এই মুহূর্তে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে—ব্যথায় তার মুখ নীল হয়ে গেছে—বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসবার আগে প্রথম সন্তান তার মায়ের শরীরটাকে হিংস্র ছুনের মতো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইছে! সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম!

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। দীর্ঘকায় গৌরকান্তি পুরুষ। অভিজ্ঞতা এবং প্রসন্নতায় মিলে আত্মপ্রতিষ্ঠ প্রবীণতা। অসঙ্কোচে যার উপরে নির্ভর করা চলে। ঝড়ের নদীর কাণ্ডারী।

রূপোর গায়ে প্লাটিনাম বসানো মস্ত সিগারেট কেস্‌টা খুললেন ডাক্তার। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। "আসুন।"

সিগারেট নিলাম। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করবার আগেই লাইটারের নীল শিখা এগিয়ে এল মুখের কাছে।

ডাক্তার বললেন, "রাত এখন তিনটে বাজে। আশা করছি ভোরের মধ্যেই ডেলিভারি হয়ে যাবে। সেফ অ্যাণ্ড সাউণ্ড।"

আমি সিগারেটে টান দিলাম। কড়া অপরিচিত সিগারেট। ধোঁয়াটা আমার শুকনো গলার ভিতরে গিয়ে আঘাত করল। ইচ্ছে করল, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিই বাইরে।

ডাক্তার সামনের সোফায় আমার মুখোমুখি বসলেন!

"আপনি কেন বসে বসে কষ্ট করছেন? বাড়ি চলে যান—আমরা ফোন করে দেব।"

"আমার ফোন নেই।"

"বেশ তো, দারোয়ান পাঠিয়ে খবর দেব।"

"থাক না। আমি এমনিই বসছি।"

প্রবীণ অভিজ্ঞার প্রসন্ন হাসি দেখা দিল ডাক্তারের মুখে।

"বুঝতে পারছি। প্রথম ডেলিভারি কি না, তাই নার্ভাস হয়ে

পড়ছেন। কিন্তু আমি তো আপনাকে বলেইছি, খুব সেফ আর ঈজি ডেলিভারি হবে—আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই।”

আমি অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করলাম। বলতে পারলাম না, স্ত্রীর কথা আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। কাল রাত্রে সেই অদ্ভুত মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাবের চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এতক্ষণ। আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম।

ডাক্তার বললেন, “অল্ রাইট। এতক্ষণ যখন বসে আছেন, তখন আরো একটু অপেক্ষাই করুন। চা আনাব এক পেয়ালা?”

“নাঃ, থাক।”

“কফি?”

“আমার কিছু দরকার হবে না—ধন্যবাদ।”

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টানলেন ডাক্তার। কোনো একটা আলোচনা শুরু করবেন, যেন প্রস্তুত হতে লাগলেন তার জন্যেই। আমি অস্বস্তিভরে একটা সচিত্র বিলিতী পত্রিকা তুলে নিলাম সামনের টেবিল থেকে।

পিছনের বড় পর্দাটার রিংয়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর সতর্ক মৃদু জুতোর আওয়াজ।

“ডক্টর—”

আমি ফিরে তাকালাম। ওই পর্দাটার রহস্যময় অন্তরাল থেকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স এসে দাঁড়িয়েছে। যেন পার্ক স্ট্রীট সেমিটারী থেকে উঠে-আসা একটা মার্বেল পাথরের মূর্তি।

“ঈয়েস্—”, গম্ভীর ব্যবহারিক প্রথায় সাড়া দিলেন ডাক্তার। উঠে দাঁড়ালেন।

“আপনি তা হলে একটু বসুন মিস্টার ঘোষাল, আমি দেখছি।”

সাদা অ্যাপ্রনপরা দীর্ঘকায় ডাক্তার নার্সের পিছনে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সচিত্র পত্রিকাটা তুলে নিয়েছি—কিন্তু একটা লাইনও পড়তে

পারছি না। পাতায় পাতায় সুন্দরী মেয়েদের রঙিন ফোটোগুলো কিউবিস্ট ছবির মত বিচিত্র হয়ে যাচ্ছে—যেন ম্যেতিস কিংবা পিকাসোর অ্যাল্‌বাম দেখছি একখানা। সামনে দেওয়ালের গায়ে গোল ঘড়িটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ছে ক্যালেণ্ডারের মত।

আর উগ্র উত্তেজনায় আমার সমস্ত স্নায়ু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওই পর্দার ওপারে আজ রাত দশটা থেকে আমার স্ত্রী থেকে থেকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। হিস্টিরিয়ার রোগীর মত আঙুলগুলোকে মুঠো করে আঁকড়ে ধরছে বিছানার চাদর, ইলেকট্রিক আলোর তলায় মন্থরগতি পাখার যেমন ছায়া পড়ে, তেমনি করে মৃত্যুর ছায়া দুলে দুলে যাচ্ছে তার মুখের উপরে। আসন্ন সন্তান পরশুরামের ভূমিকায় মহলা দিয়ে নিচ্ছে ওখানে।

সিগারেটের আগুন আঙুলে এসে লাগতে চমকে আমি সেটাকে কার্পেটের উপরেই ফেলে দিলাম, তারপর পিষে দিলাম জুতোর তলায়। মনের মধ্যেও একটা বন্দী ইচ্ছার অসহ্য পীড়ন। আমার যেন এখনি কিছু একটা করা দরকার—সমস্ত শক্তি দিয়ে যা হোক একটা করে ফেলা দরকার। কী করতে পারি—কী করতে পারি আমি?

টং টং করে তিনটে বাজার শব্দ যেন আমার হৃৎপিণ্ডে এসে পড়ল। আবার চোখ তুললাম দেওয়ালের দিকে। ক্যালেণ্ডার হয়ে ঝুলে পড়া ঘড়িটা কখন আবার গোলাকার হয়ে গেছে। শুধু তার কাচটা তরল হয়ে একটু একটু কাঁপছে যেন। ঘরের জোরালো আলো বারান্দার টবের এক গুচ্ছ ক্রোটনের ওপর গিয়ে পড়েছে—বিন্দু-চিহ্নিত ঘনবন্ধ পাতাগুলোকে দেখে মনে হল যেন একটা বাঘের বাচ্চা গুঁড়ি মেরে রয়েছে ওখানে।

বাইরে কাঁকরের উপর শিশির পড়ছে, না ফিস ফিস ক'রে কথা কইছে কেউ? আমি ওভারকোটের বোতাম খুলে ফেললাম। কাল রাত্রের মত আবার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠছে। সেই

যন্ত্রণা—সেই অদ্ভুত যন্ত্রণাটা আবার কি বুকের মধ্যে ফিরে আসছে আজকেও ?

পিছনে আবার পর্দার রিং সরল। আবার জুতোর শব্দ। মুখ না ফিরিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডাক্তার ফিরে এসেছেন। অত ভারী জুতোর আওয়াজ লঘুচ্ছন্দা নার্সের নয়।

"ছেলে হয়েছে মশাই। চমৎকার হেল্‌দি বেবি! সাড়ে সাত পাউণ্ড। কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্‌!"

বিদ্যুৎ চকিত হয়ে আমি ফিরে তাকালাম।

"আর মা ?"

"পার্ফেক্‌ট্‌লি অল্‌ রাইট। এত সহজে হয়েছে যে ফার্স্ট ডেলিভারিতে এ-রকম কদাচিৎ ঘটে। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ এগেন!"

রাত সাড়ে চারটে।

ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে হেঁটে চলেছি। শীতের শেষ রাত্রে নির্জন পার্ক স্ট্রীট। একটি মানুষের সাড়া নেই—একটা কুকুরের পর্যন্ত নয়। পথের মরা আলোয় ধোঁয়ার মত কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে।

বাঁ দিকে পুরোনো কবরের সারি বড় বড় গাছের অতিকায় ছায়ার তলায় শতাব্দীর মৃত্যু নিয়ে হিম হয়ে দাঁড়িয়ে।

একটা ট্যাক্সি দরকার। কিন্তু নিউ পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে না গেলে পাব বলে মনে হল না। অগত্যা বাঁক নিলাম ডান দিকে।

আরো কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ বুকের মধ্যে সেই যন্ত্রণাটা দেখা দিল।

সেই ভয়ঙ্কর—সেই অনাস্বাদিত যন্ত্রণা! যার সঙ্গে এর আগে কখনো পরিচয় ছিল না—যার প্রথম স্পর্শমাত্রেই মৃত্যু বলে চিনতে

ভুল হয় না। কাল রাত্রে সে অনাহূত আগন্তুক তার প্রথম সংবাদ পাঠিয়েছিল আমাকে।

মনে হল, কে যেন জোর করে আমার হাঁটু দুটোকে মুচড়ে দিচ্ছে, আমার মাথাটাকে কাঁধের ওপর থেকে মাটিতে টেনে নামাতে চাইছে। গায়ের গেঞ্জিটা একরাশ ঠাণ্ডা সাপের মত আমার পাঁজরগুলোকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। কোটের বোতাম খোলবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে শিশিরভেজা পথটার ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, অনুভব করলাম, অসহায় প্রণামের মতো আমার মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণাভরা বুকের উপর ঝুলে পড়ছে।

কিন্তু এখন আর ভয় করছে না। মনে হচ্ছে, আমার ভিতর থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল। যেন আমার হাত থেকে নিয়ে গেল অলিম্পিক মশাল। আমি থামলাম—তার শুরু হল।

কে, সে কে ? যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি দুটি ছোট ছোট পায়ের শব্দ। আমাকে ছাড়িয়ে, আমার চেতনাকে ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। মাত্র দশ মিনিট আগেই জীবন-মৃত্যুর মোহনা থেকে যে বেরিয়ে এল, এ কি সেই ? এ কি তারই পায়ের আওয়াজ ?

কৃতজ্ঞতায় প্রায় গলে গেল নিরঞ্জন।

বাস্তবিক সত্যেনদা, তুমি না থাকলে—

কিন্তু নিজের প্রশংসা কোনোদিন সহ্য হয় না সত্যেনদার। প্রগলভ স্পষ্টভাষী মানুষটি হঠাৎ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যান—চোখ নামিয়ে নেন, মেয়েদের মতো রাঙা হয়ে ওঠে মুখ। জীবনের এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অনেক অভিজ্ঞতা পার হয়ে এসেছেন—ঘা খেয়েছেন প্রচুর এবং ঘা দিয়েছেন প্রচুরতর। দরকার মতো মারামারিও করেছেন বারকয়েক—ডান গালের ওপরে কাটা দাগটাই তার প্রমাণ।

শালপ্রাংশু মহাকান্তি মানুষ। পাহাড়ভাঙা ঝড়ের মুখে উদ্ধত শালগাছের মতো রুখে দাঁড়ানোই তাঁর অভ্যাস। কিন্তু ওই একটি দুর্বল জায়গা তাঁর। প্রশংসার আঘাতটা আজো সইতে পারেন না।

অথচ নিরঞ্জনের জন্যে যা তিনি করেছেন, তাতে সে এখন তাঁর জুতোর ধূলো মাখতে শুরু করেছে মাথায়।

—দাদা, তুমি মানুষ নও।

—না, ভূত। চুপ কর বলছি—সত্যেনদা রাঙা হতে শুরু করলেন।

—তুমি সত্যেনদাই বটে। একেবারে সত্যযুগের লোক।

—আঃ—থাম্ না।

কিন্তু এত সহজেই থামবার জো কি নিরঞ্জনের! আবেগ যখন একবার এসেই পড়েছে—তখন সে দুর্নিবার। বাধা পেয়ে আরো ফেনিয়ে উঠল নিরঞ্জন।

—দু-দুটো প্রাণ তুমি বাঁচালে। এই দুঃসময়ে তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াতে তাহলে নির্ঘাৎ দশ দিন পরে ওই মোটা লোকটার সঙ্গেই মাধবীর বিয়ে হয়ে যেত। আর আমাকে খুঁজে বেড়াতে হত পটাশিয়াম সায়নাইড। না—তোমাকে সত্য যুগের লোক বললেও কম বলা হয়।

—আঃ, চুপ কর্ না স্টুপিড কোথাকার। সত্যেনদা ছটফট করে উঠলেনঃ যা যা করে নেবার—এইবেলা সব চুকিয়ে রাখ। আমি তোদের জন্যে আরো কটা জিনিসপত্র কিনে আনি।

চটিটা পায়ে গলিয়ে ঘর থেকে প্রায় পালিয়ে গেলেন তিনি।

অভিভূতভাবে নিরঞ্জন চেয়ে রইল। তার কৃতজ্ঞতার ভেতরে কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। চোখে না দেখলে সে কিছুতেই বিশ্বাস করত না একালেও এমন লোকের অস্তিত্ব আছে সংসারে।

পরিচয় মোটে দু-বছরের। একই মেসের রুম-মেট দু-জন।

এখানে আসবার পরে প্রথম কিছুদিন তো ভালো করে আলাপই হয়নি সত্যেনদার সঙ্গে। সেই কোন্ ভোরে ওঠেন অন্ধকার থাকতে। কাচের গ্লাসে ভেজানো এক মুঠো ছোলা খেয়ে দুটো বিশ-সেরী মুগুর নিয়ে চলে যান ছাদের দিকে—সেই সঙ্গে শ-পাঁচেক ডন বৈঠক। এই পঁয়তাল্লিশ বছরেও সত্যেনদা শক্ত-সমর্থ শরীর কোথাও একটু ফাটল ধরেনি—যেন পেটা লোহা দিয়ে গড়া মানুষ। বেলা সাড়ে সাতটার সময় ক্লান্তি-জড়ানো শরীরে নিরঞ্জন যখন ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্যে আর্তনাদ তোলে—তার অনেক আগেই সত্যেনদা বেরিয়ে চলে গেছেন।

কোনো বাঁধাধরা চাকরী করেন তা নয়। নানা রকমের দালালি আছে সত্যেনদার—আলুপোস্তা থেকে ক্লাইভ স্ট্রীট পর্যন্ত সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান তিনি। সবাই জানে প্রচুর রোজগারও আছে তাঁর। অথচ সংসারে নাকি কেউই নেই—তাঁর এই বারো বছরের মেস-জীবনে কোনো আত্মীয়-স্বজনকে কেউ কখনো আসতে

দেখেনি তাঁর কাছে। নিজে চিরকুমার—প্রথম জীবনেই মোহমুদ্গর পড়ে কামিনী-কামনা বিসর্জন দিয়েছেন। মেসের সকলে যেমন ভয় করে তেমনি মান্য করে তাঁকে। দরকার পড়লে অপক্ষপাত-ভাবে প্রত্যেককেই দু-দশ টাকা ধার দেন তিনি, কেউ শোধ করলে নেন—না দিলেও কখনো ফিরে চান না।

এহেন সত্যেনদার কক্ষাশ্রিত হয়ে দিন কতক রীতিমতো হীনম্মন্যতার মধ্যে কেটেছে নিরঞ্জনের। ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার—ভাতা আর টিউশনের জোড়াতালি দিয়ে দেড়শো টাকারও নীচের দিকে। ইস্কুলে টেনিস বল দিয়ে দিন কয়েক ক্রিকেট খেলা ছাড়া আর কোনো স্বাস্থ্যচর্চা কখনো সে করেনি। এই পঁচিশ বছরেই চোখের কালো কলঙ্কে পঞ্চান্ন বছরের অবসাদ। কোনো একটা দুঃসাহসিক ভয়ঙ্কর কিছু কখনো সে করে ফেলতে পারে—তাকে দেখে এ সন্দেহ কখনো কারো মনে জাগেনি।

অথচ তা-ই হয়েছে। দস্তুর মতো একটা বৈপ্লবিক কীর্তি করে বসেছে নিরঞ্জন।

'তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।' আপাততঃ নিরঞ্জন সেই সম্রাটের আসনে সমাসীন।

ব্রজভূষণ দত্তের ভারী অহঙ্কার ছিল, এক দৃষ্টিতেই তিনি মানুষ চিনতে পারেন। বিলিতি কোম্পানীর সিনিয়ার ক্লার্ক, অনেক সাহেব, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পার্শী চরিয়ে এসেছেন এতকাল। ষাট টাকার মাস্টার নিরঞ্জনের জীর্ণ নিরীহ দেহ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এই আশ্রম-মৃগটিকে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে তাঁর মেয়ের প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করা যেতে পারে।

অন্তত একবার ভুল করলেন ব্রজভূষণ দত্ত। কথামালার গল্পের আর একটা দিকও আছে—গাধার। চামড়ার তলাতেও কখনো কখনো সিংহ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পঁচিশ বছরের চোখে পঞ্চান্ন বছরের অবসাদ টানা নিরঞ্জনও শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করল

দস্তুরমতো একটা নায়করূপে। দু' চোখের জল মুছতে মুছতে মাধবী বললে, তুমি যদি এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা না করতে পারো তাহলে আসছে ফাল্গুন মাসেই বাবা সেই মোটা কালো থাকোহরি পালের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

মোটা এবং কালো—এবং থাকোহরি পাল! নিরঞ্জন দেখেছে বইকি তাকে। থপ থপ করে হাঁটে, এক-একবারে দুটো করে পান পুরে দেয় মুখের মধ্যে। তার সঙ্গে মাধবীর বিয়ে! দৈত্যের হাতে রাজকন্যা তুলে দেওয়া ছাড়া একে কী বলা যায় আর! টাকাটাই যদি বড় হয়, তাহলে লোহার সিন্দুকের সঙ্গেই বিয়ে দিলে চলে—একটা মানুষকে আর অনর্থক টেনে আনা কেন!

অতএব—

অতএব আগামী ফাল্গুন মাসের শর্ষে ক্ষেতটা এরই মধ্যে চোখের সামনে দেখতে শুরু করেছে নিরঞ্জন।

অবশ্য ব্রজভূষণ দত্তকে গিয়ে বলা যায়। সকালবেলা এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে শশার কুচি দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে এবং কাচের গ্লাসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ব্রজমোহন যখন সোনার বাজারদর পড়েন, তখন ঢিপ করে একটা প্রণাম করা যায় তাঁর পায়ে। বলা যায়, আপনার মেয়েটিকে আমি চাইতে এসেছি—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।

হয়তো বলা যায়, এবং বলা যায় তার পরের অধ্যায়টুকুও। গোঁফগুলোকে কিছুক্ষণ খাড়া করে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন ব্রজভূষণ। তারপর ধাতস্থ হলে একটা গর্জন ছাড়বেন এবং পরক্ষণেই নিরঞ্জনের মুখের ওপরে গরম চা-শুদ্ধ কাচের গ্লাসটা এসে আছড়ে পড়বে। হাসপাতালে থাকতে থাকতেই নিরঞ্জন খবর পাবে—ব্রজভূষণ আর ফাল্গুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি, সাতদিনের মধ্যেই থাকোহরির হাতে মাধবীকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন তিনি। সুতরাং—

সুতরাং পটাশিয়াম সায়ানাইড না পেলে নেহাৎ পক্ষে কার্বলিক অ্যাসিড অথবা টিংচার আয়োডীনেই চলে কিনা এবং তাকে কী পরিমাণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—এই দুরূহ গবেষণায় যখন মগ্ন ছিল নিরঞ্জন সেই সময় তার ওপর দৃষ্টি পড়ল সত্যেনদার।

—অমন মিইয়ে যাচ্ছ কেন হে? টি-বি ফি-বি হল নাকি? এতবার বলেছি, রাস্তার ধারের ওসব ভেলেভাজা খেয়ো না—

—তেলেভাজার দোষ নেই সত্যেনদা। টি-বিও হয়নি। হয়েছে তার চাইতেও মারাত্মক।

—তার চাইতেও মারাত্মক?—সত্যেনদা ঘন হয়ে বসলেন: মানে?

সত্যেনদার মতো নৈষ্ঠিক চিরকুমারের কাছে ব্যাপারটা বলা শক্ত, গোপন করা আরো শক্ত। অতএব প্রচুর পরিমাণে ঢোক গিলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বলেই ফেলল নিরঞ্জন। এবং আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে ভাবতে লাগল, এইবার সত্যেনদা তাকে লৌহবাহুতে আলিঙ্গন করে ধরবেন, তেতলার রেলিং পার করে সোজা ছেড়ে দেবেন নীচের কলতলার ওপরে।

কিন্তু আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য—কিছুই করলেন না সত্যেনদা। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, কয়েক টিপ্ নস্যি নিলেন পর পর। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটির বয়েস কত?

—হবে বছর আঠারো।

—রেজিস্টার্ড ম্যারেজে আটকাবে না তা হলে।

—তা আটকাবে না। নিরঞ্জন করুণ হাসি হাসল: কিন্তু তারপর?

—তারপর আবার কী? ঘর-সংসার করবে।

—কিন্তু ব্রজভূষণবাবু স্কুলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। চাকরীটা যাবে। তার ওপরে গোটা দুই ষণ্ডা ভাইপো আছে ওঁর—দাঙ্গার

সময় নাকি কালী বোমা তৈরী করত তারা। কলকাতা শহরে থাকলে তাদের হাত থেকে—

সত্যেনদা হাসলেন : সেজন্যে ভেবো না। একদিন দেখিয়ে দিয়ো ছুটোকে—তুলে আছাড় মেরে দেব।

—একদিন আছাড় মারলে তো চিরদিনের ভাবনা মিটবে না!—নিরঞ্জন প্রায় কেঁদে ফেলল : তুমি তো সব সময়ে বডিগার্ড হয়ে থাকতে পারবে না আমার। সন্ধ্যের অন্ধকারে কোনো গলি ঘুঁজিতে যদি ধাঁ করে ছুরি চালিয়ে দেয়—

—হুঁ!—সত্যেনদাকে চিন্তিত দেখা গেল : পরিস্থিতিটা একটু জটিলই বটে! প্রেমে পড়বার কি আর জায়গা পেলি না হতভাগা।

নিরঞ্জন ধরা গলায় বললে, কিউপিড্ ইজ ব্লাইণ্ড্ সত্যেনদা।

—চুপ কর্ মূর্খ। সত্যেনদা ধমক দিলেন : লাইফ ইজ স্পেকুলেশন। যা করবি, স্পেকুলেট করেই করা উচিত। তাতে রিস্ক আছে বটে কিন্তু অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া মানে তো ইন্সলভেন্সি!—ব্রোকার সত্যেনদা ব্যাপারটা বিশদ করলেন নিজস্ব পরিভাষায়।

—কিন্তু এখন—

—দাঁড়া, ভেবে দেখি—সত্যেনদার স্নেহটা গভীর হয়ে উঠলেই তুমি থেকে 'তুই'তে নামে : তুই দিন কয়েক ডন-বৈঠক দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোল্—আমি ভেবে চিন্তে একটা ফয়শালা করে ফেলছি।

তারপর সত্যেনদা যা করলেন, তা এই কলিকালে অশ্রুতপূর্ব এবং অশ্রুতব্য। আত্মীয় নয়—প্রতিবেশী নয়, এমন কি এক জেলার লোকও নয়। এই মেসে আসবার আগে মুখচেনা পর্যন্তও ছিল না। তবু সত্যেনদাই উৎসাহী হয়ে করে দিয়েছেন সব কিছু।

ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। আজকেই রাত সাড়ে ন'টার বম্বে মেলে মাধবীকে নিয়ে জব্বলপুরে পাড়ি দেবে নিরঞ্জন। সেখানে

সত্যেনদার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, পরের দিনই রেজিস্টার্ড ম্যারেজের বন্দোবস্ত করবেন তিনি। তারপর চিরিমিরি না কোথায় একটা চাকরীও তিনি করে দেবেন নিরঞ্জনের। পথ খরচ ইত্যাদি ছাড়াও শ' তিনেক টাকা দিয়ে দেবেন সঙ্গে—ওদের দু'জনের যাত্রাপথ করে দেবেন নির্বিঘ্ন এবং নিষ্কণ্টক।

নিরঞ্জন এবার সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল।

—দাদা, পূর্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে?

—আমি কি জাতিস্মর?—লজ্জিত সত্যেনদা সরে গিয়েছিলেন সামনে থেকে।

অভিভূতভাবে বসে বসে অতীত স্মৃতির রোমন্থন করছিল নিরঞ্জন। এমনও আশ্চর্য মানুষ আছে সংসারে—এমনও বিস্ময় আছে জীবনে। কবিতা লেখার হাত থাকলে সত্যেনদাকে নিয়ে রামায়ণের মতো একখানা মহাকাব্য রচনা করত নিরঞ্জন—তাঁর চরিতগাথা পড়ে ধন্য হত কলিযুগের লোক। ব্রজভূষণ দত্ত তো কোন্ ছার—তাঁর ষণ্ডা ভাইপো দুটো পর্যন্ত জগাই মাধাইয়ের মতো উদ্ধার হয়ে যেত।

সত্যেনদা ফিরলেন। তাঁর দু বগলে দুটো প্রকাণ্ড বাণ্ডিল।

—এসব আবার কী! তেল, সাবান, শাড়ী!—নিরঞ্জন বিব্রত হয় উঠল: কেন এ সমস্ত পাগলামি করছ!

—চুপ কর্ গর্দভ! ওই কাঁধছেঁড়া টুইলের শার্ট পরে বিয়ে করবি নাকি তুই? সব জিনিসের একটা সিস্টেমা আছে তো! আমারও একটা দায়িত্ব রয়েছে—তা জানিস? আমি এখন বরকর্তা—কন্যাকর্তা দুই-ই।

এবার আর কৃতজ্ঞতার ভাষাও যোগাল না নিরঞ্জনের মুখে। তার বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

দেশবন্ধু পার্কের নিরালা কোনটাতে সত্যেনদাই দাঁড়িয়েছিলেন ট্যাক্সি নিয়ে।

শীতের ঝাপ্‌সা কুয়াশায় আলোগুলো মলিন। ঠাণ্ডাটা একটু বেশি পড়েছে বলে ভ্রমণার্থীরা পার্কের মায়া কাটিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এই সাড়ে আটটার মধ্যেই লোকচলা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে এদিকটায়। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন সত্যেনদা। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে রক্ত ফুটে উঠছে তাঁর—এই শীতের ভেতরেও কণায় কণায় ঘাম জমছে কপালে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হল তাঁর; অনেক দেখেছেন, অনেক করেছেন—পেরিয়ে এসেছেন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধ্যায়; কিন্তু আজকের মতো, এই শীত-শিথিল রাত্রির মতো, এমন মর্মচ্ছেদী তীক্ষ্ণ অনুভূতির যন্ত্রণায় কোনোদিন জর্জরিত হননি তিনি। মনে হচ্ছে, নিরঞ্জন নয়—তিনিই যেন মাধবীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশযাত্রায়!

চোখ-মুখ জ্বালা করছে, গলার ভেতরটা আঠার মতো চট্‌চট্ করছে তৃষ্ণায়। কেমন অসুস্থ বোধ হচ্ছে যেন। সত্যেনদা ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। এখনো আসছে না কেন ওরা—কেন দেরী করছে এমনভাবে?

সত্যেনদার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল হঠাৎ। ধরা পড়ে গেল নাকি?

অস্থিরভাবে পা ঠুকতে লাগলেন সত্যেনদা। অদ্ভুত বিশ্রী লাগছে শরীরটা। কখনো সিগারেট খান নি—আজ একটা পেলে খেয়ে দেখতেন। আঃ—সাড়ে আটটা যে বাজে। কখন আসবে ওরা?

ওরা এল। এল বাঁ দিকের অন্ধকার গলিটার ভেতর দিয়ে দ্রুতপায়ে। নিরঞ্জন আর মাধবী।

প্রায় রুদ্ধশ্বাস গলায় নিরঞ্জন বললে, সামান্য দেরী হল।

—তা হোক—তা হোক। সত্যেনদা একবার তাকালেন মাধবীর দিকে, পর্যবেক্ষণ করলেন নিরঞ্জনের মানসীকে।

নাঃ, রুচি আছে ছোকরার। দিব্যি মেয়ে পেয়েছে।

ভীত-ম্লান মাধবীকে নিরঞ্জন বললে, এই সত্যেনদা। প্রণাম করো এঁকে। এঁর জন্যেই সব। না হলে--নিরঞ্জনের গলা বুজে এল।

দুটি ডাগর কালো চোখে টলমলে অশ্রুবিন্দু নিয়ে মাধবী নত হয়ে পড়ল সত্যেনদার পায়ের কাছে।

—থকি—থকি—সত্যেনদা বিব্রত হয়ে উঠলেন ঃ চিরসুখী হও! —অধৈর্যভাবে ঘড়ির দিকে তাকালেন ঃ আটটা পঁয়ত্রিশ। আর দাঁড়ানো ঠিক নয়। উঠে পড়ো গাড়িতে। রিজার্ভেশন আছে আমার নামে। গিয়েই ভেতর থেকে লক্ করে দেবে ক্যুপের। সকালের আগে আর জানলা খুলবে না।

—সত্যেনদা—কিছু বলতে চেষ্টা করল নিরঞ্জন।

—ওঠো, ওঠো—হারি আপ। জব্বলপুরে গিয়ে চিঠি দিয়ো। জিনিসপত্র সব তুলে দিয়েছি ক্যারিয়ারে—মিলিয়ে নিয়ো নামাবার সময়। আচ্ছা—আব্ গাড়ি ছেড়ি দিজিয়ে সর্দারজী—

গাড়ি চলে গেল। দীনেন্দ্র স্ট্রীটের দূরান্তে—শীতের কুয়াশাভরা প্রায়ান্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোর মতো ক্ষীণতম হয়ে মিলিয়ে গেল ব্যাকলাইটের লাল আলো। এক্‌জস্ট পাইপ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া পোড়া তেলের গন্ধ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল আড়ষ্ট মন্থর বাতাসে।

সত্যেনদার ঘোর ভাঙল। এই দশ-বারোটা দিন যেন কেটেছে একটানা একটা নেশার বিহ্বলতায়। সেই নেশাটা কেটেছে এতক্ষণে—সারা দেহ-মনে রেখে গেছে একরাশ কঠিন অবসাদ।

মেসের দিকে ফিরবেন? তার চাইতে একটু বিশ্রাম করা যাক। একটু বসা যাক এই শীত-নির্জন পার্কের নিরালায়।

একটা ন্যাড়া গাছের তলায়—শূন্য একটা বেঞ্চি খুঁজে নিয়ে বসলেন সত্যেনদা। কিন্তু এত খারাপ লাগছে কেন শরীর—কেন

গলার ভেতরটা এমনভাবে শুকিয়ে গিয়ে চট্‌চট্‌ করছে আঠার মতো? কেন মনে হচ্ছে, পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যায়ামে-নিয়মে গড়া দেহের মধ্যে এমন একটা অসহ অসুস্থতা? নিজেকে কেন এমন নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে—অনুভব করছেন জীবনে তাঁর কেউ নেই?

ব্রোকার বিনয় মিত্রকে মনে পড়ছে।

ঃ বিয়ে করলেন না সত্যেনবাবু, ভাবছেন—বেশ আছেন। কিন্তু বয়েস যখন আরো বাড়বে, যখন আপনার এই শক্ত শরীরেও ভাঙন ধরবে, তখন টের পাবেন। বুঝবেন, এমন একটা সময় আসে, যখন কারো কাছে আশ্রয় চাই আপনার—চাই বিশ্রাম—

ভাঙন কি ধরেছে? তাই কি এমন অস্বস্তির যন্ত্রণা বুকের মধ্যে? তাই কি হৃৎপিণ্ডটা এমন দ্রুততালে ধুক্‌ধুকিয়ে উঠছে থেকে থেকে?

দশ-বারোটা বিগত দিন যেন খরধার বিদ্যুতের মতো জ্বলে গেল মনের সামনে। চমকে উঠলেন সত্যেনদা। একি উদারতা? একি মহত্ত্ব? এই অর্থহীন অবিশ্বাস্য ঔদার্যের পেছনে আর কি কোনো কারণ ছিল না? জীর্ণদেহ, প্রায়-নির্বোধ নিরঞ্জনকে প্রতীক করে তিনি কি নিজের জন্যেই রচনা করেন নি এই অর্ঘ্য? এই উপচার?

ঠকিয়েছে তাঁকে নিরঞ্জন—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁর সঙ্গে। পথের আলোয় তিনি পরিষ্কার দেখেছেন মাধবীকে! লক্ষ্মীর মতো মূর্তি। এ লক্ষ্মী এসেছিল তাঁরই কাছে প্রতিষ্ঠার জন্যে—এক ধাক্কায় নিরঞ্জনকে ছিটকে ফেলে দিয়ে তিনিই তো—

ধড়্‌ফড় করছে বুকের মধ্যে। গলার ভেতর সেই তৃষ্ণার যন্ত্রণা। বুড়ো হয়ে গেছেন সত্যেনদা—চিড় ধরেছে দেহে-মনে। ঠিকই বলেছিল বিনয় মিত্র।

উঠে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলেন পার্ক থেকে।

রোয়াকে বসো বিড়ি খোচ্ছিলেনু ব্রজভূষণ। সেত্যেনুদা সোমুনো এসো দাঁড়ালেনু।

—আপনার মেয়ে মাধবীকে নিয়ে বম্বে মেলে পালাচ্ছে তার প্রাইভেট টিউটার নিরঞ্জন রায়। ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলে এখনো ধরতে পারবেন তাদের। হাঁ—এস এন হালদার অ্যাণ্ড পার্টি লেখা ক্যাপেতেই খুঁজে দেখবেন—এখনো সময় আছে।

পাশের ফ্ল্যাটের অনুপমবাবুর সঙ্গে দেখা হল সিঁড়ির মুখেই। আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কি মশাই, এক মাসের ছুটি ছিল না আপনার? দশ দিনের মধ্যেই যে ফিরে এলেন?"

অহি আস্তে আস্তে জবাব দিলে, "ফিরে আসতে হল!"

"বউমা কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না। তিনি কি বাপের বাড়ি চলে গেলেন নাকি?"

"চিরদিনের মতই চলে গেছে সে। আর আসবে না—।" গলাটা ধরে এল অহির।

অনুপমবাবু থমকে গেলেন। পাথরের মূর্তির মতো।

তাঁর স্তম্ভিত জিজ্ঞাসার জবাব দিলে অহি নিজে। বিবর্ণ মুখে খানিকটা শীতল হাসি ফুটিয়ে বললে, "গত রবিবারে চলে গেছে। তিন দিনের জ্বরে। হার্ট ফেলিয়োর।"

অনুপমবাবু তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার তালাটা খুলে অহি পিছনের কুলিটাকে ডেকে বললে, "ভেতরে আয়।"

জানালা-বন্ধ ঘরটার ভিতরে খাটের এক কোনায় চুপ করে বসে রইল অহি। অনেকক্ষণ।

স্বপ্ন। তা ছাড়া কী আর? আশ্চর্য—ভাবতে পারা যায় গায়ত্রী নেই? এ-ঘরে নেই—বাইরে নেই—পৃথিবীর কোথাও নেই। অথচ তার অস্তিত্ব সারা ঘরে এখনো মৃদু গন্ধের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। যাওয়ার আগের দিন যে রজনীগন্ধাগুলো কেনা হয়েছিল, তাদের প্রায় সবগুলিই ফুলদানির দু' পাশে ঝরে পড়েছে, দু-চারটে

ফুটে আছে এখনো। বেরুবার সময় তাড়াতাড়ি শেষ প্রসাধনটুকু সেরে নিয়েছিল গায়ত্রী, এখনো ড্রেসিং টেবিলের উপর ফেস্ পাউডারের গুঁড়ো ছড়ানো। খাটের উপর ছেড়ে যাওয়া শাড়িটা তেমনি তাল পাকিয়ে রয়েছে, সেটা স্পর্শ করতেই মনে হল ওর মধ্যে এখনো গায়ত্রীর দেহের সেই উত্তাপ—তেমনি চঞ্চল, জীবন্ত।

অথচ সে নেই—কোথাও নেই! কেউ আর কোনোদিন তাকে খুঁজে পাবে না।

বাইশ বছর বয়েস হয়েছিল গায়ত্রীর। এর মধ্যে মিশনারী স্কুলে পড়েছে সে—স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়েছে। আরো একটু বড় হয়ে স্বাস্থ্যে ঝলমল শ্রীমতী মেয়েটি বিনুনি ছুলিয়ে এসে ভর্তি হয়েছে কলেজে। ডিবেটিংয়ে যোগ দিয়েছে, কলেজ ইউনিয়ন নিয়ে আন্দোলন করেছে। অবসরের ঘণ্টায় কলেজের লনে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে—আর, আর স্বপ্ন দেখেছে। ওর বয়েসের মেয়েরা যেমন দেখে।

তারপর তিন বছর অহিভূষণের সঙ্গে বিবাহিত জীবন। স্বপ্নের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটেছে একে একে। যা সুর ছিল তা গান হয়ে দেখা দিয়েছে। এক টুকরো কান্নার উপর এক ঝলক হাসি শত রঙ ফুটিয়েছে তক্ষুনি। রাত এসেছে সেতারের গুঞ্জন নিয়ে—দিনের আলো দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো।

এর মধ্যে কোথাও এই সাতটা দিন ছিল না। নির্জন পুরুলিয়া রোড, তার ছুধারে বড় বড় গাছের ঘন গম্ভীর ছায়া; সোনার রেখার মত দিনান্তে সুবর্ণরেখার জল; ছোট্ট রেলওয়ে ব্রীজটা; নামকুমের সেই বাংলো—আর তার সামনেই ফুটন্ত চন্দ্রমল্লিকা।

পুরনো দিনগুলির সঙ্গে এ পর্যন্ত এই সাতটা দিনেরও মিল ছিল। কোনো ছবির উপর আরো একটুখানি রঙের ছায়ার মত—কোনো গানের আরও একটুখানি বিস্তীর্ণ তানের মত। তার পরে

সব এলোমেলো—সব আকস্মিক। হুড্রু আর রাজরূপা বেড়িয়ে ফিরে এসেই একশো চার টেম্পারেচার। একশো পাঁচ—

ছু হাতে কপালটা টিপে ধরল অহি। স্বপ্ন! কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! ছেঁড়া ছেড়া—টুকরো টুকরো। অবিশ্বাস্য আটচল্লিশ ঘণ্টা। সেই প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরেই আরক্ত চোখ মেলে গায়ত্রী ফিস ফিস করে বলেছিল, "তুমি খেয়েছ তো ভালো করে? আমি উঠতে পারলুম না, দেখতেও পেলুম না তোমার খাওয়া।" আগুনের হলকার মতো কয়েকটা নিশ্বাস লেগেছিল অহির হাতে। "ভারী কষ্ট হচ্ছে তোমার। ভেবো না, কালই আমার জ্বর ছেড়ে যাবে।"

জ্বর ছেড়ে গেল। পরের দিনই।

অহি যেন তখনো বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, ছু দিনের অসহ্য যন্ত্রণার পরে এতক্ষণে বুঝি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে গায়ত্রী। রুক্ষ চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে গিয়ে সে টের পেল, গায়ত্রীর কপালটা ঠাণ্ডা, অদ্ভুত ঠাণ্ডা।

আবার ছেঁড়া ছেঁড়া ছায়া। বিকেলের শেষ আলো। সুবর্ণরেখার জলে এক অঞ্জলি সোনা। চিতার উপর একরাশ টকটকে অঙ্গার। কলসী করে জল ঢেলে দেবার পরে তা থেকে পর-পর কতগুলো প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাস। কালো হয়ে যাওয়া ব্রীজটার উপরে একটা অন্ধকার ট্রেন।

ডাক্তারেরা ডায়গনোসিস্ করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন।

গায়ত্রীর বাইশ বছরের জীবন। এই সাতটা দিন কোথা থেকে এল তার মধ্যে? এর আগে তারা কখনো ছিল না—এর পরেও তারা কখনো আর ফিরে আসবে না। শুধু মাঝখান থেকে গায়ত্রীকে কেড়ে নিয়ে গেল। সেই সন্ধ্যাজড়ানো ছুটো চকচকে রেল লাইন দিয়ে: সেই ব্রীজের উপর দিয়ে গম গম করে চলে যাওয়া অন্ধকার ট্রেনটায়: যেটা কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না, কোথায় যাবে তা-ও কারও জানা নেই।

অহি চোখ মেলে তাকাল। স্বপ্নই তো। কলকাতার সেই ঘর। ড্রেসিং টেবিলের এক ধারে বিয়ের সময়কার ছবি। আলনায় শাড়ি, জামা, লাল চটি। অর্গানের উপরে রাখা স্বরবিতানের তিন খণ্ড। কাচের আলমারিতে কৃষ্ণনগর আর ছোট বড়ো বিলিতী পুতুল। শেল্‌ফে বই।

শুধু এই কেন? সব। এই ঘর—রান্না ঘর—বসবার ঘর। অহির মনে হতে লাগল, গায়ত্রী ছাড়া এখানে যেন আর কিছু ছিল না, কেউ ছিল না। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বটাও না। গায়ত্রী না থাকলে এ-ঘর—এই ফ্ল্যাটের যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই অফিসে যাওয়ার, ইন্‌ক্রিমেন্টের খবর নেবার, ঠিক ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ফিরবার, দু দিন আগে থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নতুন ভালো ছবির টিকেট কিনবার।

"এমন করে বসে থেকে আর কী করবেন বলুন?"

ভয়ানকভাবে চমকে উঠল অহি।

পাশের ফ্ল্যাটের অনুপমবাবু এসেছেন।

"সবই তাঁর ইচ্ছে।" সমবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অনুপমবাবু।

কার ইচ্ছে? অনুভূতিহীন মস্তিষ্কটা পাথরের পিণ্ডের মতো হয়ে আছে—কথাটা তার উপর আছড়ে পড়ে যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কার ইচ্ছে? ওই টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিতে চাইল অহি, কথাটার উত্তর খুঁজতে চাইল, পারল না।

"জানলাগুলো খুলে দিন না! অন্ধকারে এমনি বসে থাকলে আরো খারাপ লাগবে যে!"

নিজেই খুলে দিলেন দক্ষিণেরটা। খানিকটা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল ঘরে, আর এল তীক্ষ্ণ একটা আলোর ঢেউ। হঠাৎ যেন চোখে কেমন ধাঁধা লাগল অহির। আর মনে হল, এতক্ষণ

এই বন্ধ ঘরে গায়ত্রীর যে উপস্থিতি নিবিড় হয়ে জড়িয়ে রেখেছিল তাকে—এই মুহূর্তে একটা নিঃশব্দ কান্নার হাহাকার তুলে সেটা বাইরের আলোর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর সঙ্গে সঙ্গে হু হু কেঁদে ফেলল সে। প্রথম। গায়ত্রীর মৃত্যুর চারদিন পরে।

স্কুল-মাস্টার অনুপমবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখের কোনা চক চক করছে। অনেক ভালো ভালো কথা তাঁর জানা আছে—মৃত্যু সম্বন্ধে বিস্তর উদ্ধৃতি তিনি দিতে পারেন ইংরেজী থেকে,—সংস্কৃত থেকে। এমার্সন-কার্লাইল-রাস্‌কিনের ভক্ত পাঠক তিনি ঃ টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম' কণ্ঠস্থ—'মোহ-মুদ্গরের' দরকারী কথাগুলো সবই তাঁর মুখে মুখে। কিন্তু—

শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে ফেলতে হল তাঁকে। ধরা গলায় বললেন, "উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে নিন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

লজ্জিত হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলে অহি। আত্মসম্মান। স্কুল-মাস্টার অনুপমবাবুর সামনে এমনভাবে দুর্বল হওয়া চলে না।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে। আবার একা। নিজেকে নিয়ে বসে থাকা। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া। গায়ত্রীর নিজের হাতে সেলাই করা সম্বলপুরী পর্দাটা উড়ছে। আলোরর ঢেউ। রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ। ফিরিওলার চীৎকার। কলকাতা।

কলকাতা। অফিস। দিনের পর দিন।

কিন্তু রজনীগন্ধা আর কিনতে হবে না। দাঁড়াতে হবে না সিনেমার লাইনে। জামা-কাপড়ের ভাঁজ সম্পর্কে আর সতর্ক থাকবার দরকার নেই। হোটেলে যা খুশি খেলেই চলবে, কেউ বারণ করবে না।

বিহ্বলভাবে অহি তাকিয়ে রইল। এতক্ষণ মনে হয়েছে, কী একা সে সংসারে, কী অসম্ভবভাবে একা! মনে হয়েছে, এই তিন

বছর নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও সে ভাবেনি। এখন থেকে ভাবতে হবে। জামা-জুতোর কথা, টাকা-পয়সার কথা, ঝি-চাকরের কথা, প্রতি মুহূর্তের কথা।

চাকরকে যাওয়ার সময় এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। তখন কে জানত—দশদিন যেতে না যেতেই ফিরে আসতে হবে এমন করে। অথচ আজই একটা লোক দরকার। কোথায় পাওয়া যায়? গায়ত্রী জানত--অহির জানা নেই।

চারদিকে সমুদ্র। গয়লা কতটা দুধ দেয়? মাসের বাজারের খরচ কত? ধোপার হিসেব কী? কোন্ বাক্সের কোন্‌টা চাবি? গায়ত্রীর এই ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস যে সে সঙ্গে করে এনেছে, দুটো রিংয়ের বিশাল অরণ্য থেকে কতক্ষণে সে এদের চাবি রিসার্চ করে বের করবে? যাওয়ার আগে দোকানে স্টোভটা রিপেয়ার করতে দিয়ে এসেছিল গায়ত্রী, কিন্তু কোন্ দোকানে?

সমুদ্র। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে অহি। ব্যাঙ্কের চেক-বই দুটোই বা কোথায় আছে? কত কাছে অ্যাকাউণ্টে?

আসবার আগে সকলকে চিঠি দিয়েছে। কালই হয়তো পূর্ণিয়া থেকে মা-বাবা এসে পড়বেন। বিকেলে হয়তো শ্বশুরবাড়ীর ওরা এসে পৌঁছবে হাজরা রোড থেকে। এক প্রস্থ বীভৎস শোক, খানিকটা কুৎসিত কান্না। আরো অসহ্য লাগবে অহির। নিজের যন্ত্রণার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে দেবে না ওকে—শোকের উৎকট উচ্ছ্বাসে ওকে জর্জরিত করে তুলবে।

পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। গায়ত্রী না-থাকা এই ঘরটা দুঃসহ। প্রয়োজন-ফুরিয়ে-যাওয়া এই কলকাতা দুর্বিষহ। আরো অসহ্য, জীবন। কোনো মানে হয় না। অত্যন্ত স্থূলভাবে অহির মনে হল, কোনো অর্থ ই হয় না এভাবে বেঁচে থাকবার।

শূন্য। কোথাও কোনো রঙ নেই। মস্তিষ্কটা যেন পাথরের পিণ্ড। যা কিছু ভাবনা—যা কিছু আবেগ, তার উপরে ঘা লেগে

কাচের মত ভেঙে পড়ছে। পালিয়ে যাবে অহি? জীবনের কাছ থেকে? এখনি কি ঝাঁপ দেবে সামনের ওই জানলা দিয়ে? তেতলা থেকে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়বে নীচের ফুটপাথের উপর?

অহির বুকের ভিতর শির শির করতে লাগল—ফুলে ফুলে উঠতে চাইল গলার রগগুলো। নিজের একখানা হাত হাঁটুতে লাগতেই ভয়ঙ্করভাবে চমকে গেল সে। কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন গায়ত্রীর হিম মৃত শরীর থেকে ওটা তার হাতে জড়িয়ে গিয়েছে।

অহির ভয় করতে লাগল। অদ্ভুত অপরিচিত ভয়। কী মনে করে ঠাণ্ডা হাতটা সে ঘষতে লাগল খাটের জাজিমে। তারপর উঠে গিয়ে নিজেই সে জানলা খুলে দিতে লাগল। একটা—তারপর আর একটা।

না—ঝাঁপ দেবার জন্যে নয়। হঠাৎ তার মনে হয়েছে, এই ঘরটাতে আরো আলো আসা দরকার ঃ আরো উত্তাপ ঃ আরো কলকাতা ঃ আরো কোলাহল। বড় বেশি ঠাণ্ডা ঘরটা। যেখানে হাত দেবে, মনে হবে সেখানেই সে গায়ত্রীর হিম-হয়ে-যাওয়া শরীরটাকে স্পর্শ করছে।

"আপনার চা।"

কোমল গলায় ঝঙ্কার। জয়া। অনুপমবাবুর থার্ড ইয়ারে পড়া মেয়েটি। এখনো রাত্রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে বলে নিজেদের মধ্যে কত ঠাট্টা করত ওরা। ও আর গায়ত্রী।

চা এনেছে জয়া। কিছু মিষ্টি, কিছু ফল।

"এসব কেন আবার?" বলেও অহি টের পেল, তিন দিন পরে তার খিদে পেয়েছে।

"মা পাঠালেন।" শ্যামবর্ণ মেয়েটি আস্তে আস্তে বললে, "আপনি ট্রেনের জামাকাপড় ছেড়ে নিন। কয়লায় সব কালো হয়ে রয়েছে যে!"

গায়ত্রীর ট্রাঙ্কের উপর চাবির গোছা দুটো পড়ে ছিল। সেদিকে দেখিয়ে কাতর হয়ে অহি বললে, "অতগুলো চাবির ভিতর থেকে বাক্সের চাবি আমি খুঁজে পাচ্ছি না!"

"আমি দেখছি।"

হাঁটু ভেঙে জয়া ট্রাঙ্কটার পাশে বসে পড়ল। ভুরে শাড়ির উপর দিয়ে নেমে পড়ল থরে থরে চুলের ঝর্না। গভীর কালো—সবচাইতে অন্ধকার রাত্রির চাইতেও অন্ধকার। এই চেঁচিয়ে বই-পড়া শ্যামবর্ণা মেয়েটার মাথায় এত নিবিড়, এত আশ্চর্য চুল তরঙ্গিত হয়েছিল, এতদিন কে ভাবতে পেরেছিল সে-কথা!

আরো আশ্চর্য, মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই ট্রাঙ্কটার তালা খুলে গেল। অথবা আরো কম সময়ে। অথচ অহি ভেবেছিল, ও-ট্রাঙ্কটার তালা আর কখনো খুলবে না, কোনদিনই না!

মুখ ফিরিয়ে, এক ঝলক স্মিত হাসিতে জয়া বললে, "এই নিন—বাক্স খুলে দিয়েছি আপনার।"

আর তখন—তখন ভারী একটা লজ্জা পেল অহি। মনে পড়ল পাঁচ দিন সে দাড়ি কামায়নি—দুদিন কাপড় বদলায়নি, ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় কী বিশ্রী, কী বুনো দেখাচ্ছে তার চেহারা!

রাস্তা দু মাইল, এবং বেশ ভালো রাস্তা। স্টেশনে টমটমও পাওয়া যায়। উঠে বসলেই চোখ বুজে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তবু কেন যে এই শীতের সকালে স্টেশনে গিয়ে আগ বাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে, সেটা কিছুতেই বোধগম্য হল না।

সিতাংশু বিদ্রোহ করে বললে, "আমি পারব না।"

মা কাতর হয়ে বললেন, "লক্ষ্মীটি কথা শোন। ও-বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই বলেই তোকে বলা। ঠাকুরপো বেরিয়েছেন মহলে, কানাই স্কুলের টীমের সঙ্গে কোথায় ফুটবল খেলতে গেছে। চাকরটা জ্বরে পড়েছে। তাই টেলিগ্রামটা পেয়েই মায়া বললে, সিতু যদি একটু কষ্ট করে—"

"কষ্ট করে!" সিতাংশু খেঁকিয়ে উঠল, "সাড়ে ছটায় ট্রেন আসবে, তার মানে সাড়ে পাঁচটায় বেরুতে হবে আমাকে। সাইকেলটার চেন ছেঁড়া, সুতরাং সোজা হণ্টন। তারপরে ওই শীতের মধ্যে মাঠের কন্‌কনে হাওয়ায় তোমার সই মায়ার ফরমাস খাটতে গিয়ে আমার যদি ডবল-নিমোনিয়া হয়, তা হলে আমায় দোষ দিতে পারবে না তুমি। আগেই বলে দিচ্ছি সে-কথা।"

মা বললেন, "বালাই—ষাট। নিমোনিয়া হবে কেন? গরম কোটটা গায়ে পরে যাবি। একটু ঢেকে-ঢুকে গেলে শীতের হাওয়া তো ভালোই—শরীরের উপকার হবে।"

সিতাংশু চটে গেল, "তুমি আর ডাক্তারি কোরো না মা; আমি এবার ফাইন্যাল এম. বি. দিয়েছি, ও-কাজটা আমার। আমি সাফ কথা বলছি—আমাকে দিয়ে হবে না।"

মাও রেগে উঠলেন, "কেন হবে না? মেয়েছেলে একা আসবে নাকি?"

"কেন আসবে না? বেনারস থেকে সাড়ে চার শ মাইল একা আসছে, আর ছু মাইল আসতে পারবে না?"

"তর্ক করিসনি সিতু—" মা এবার অভিভাবকের মূর্তি ধরলেন, "যা বলছি তাই করতে হবে। কাল সকালে তুই স্টেশনে যাবি।"

সিতাংশু গোঁজ হয়ে বললে, "পরীক্ষার পর দেশে এসে কী ভুলই করেছি। ওরা দল বেঁধে দিল্লী বেড়াতে গেল, আর খেজুর-রসের লোভে বাড়িতে এসে আমার এই ছুর্গতি! এইজন্যেই শাস্ত্রে লোভকে রিপু বলা হয়েছে।"

মা হেসে ফেললেন। সিতাংশুর গা জ্বলতে লাগল।

কিন্তু যেতেই হল শেষ পর্যন্ত। সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায়, সেই ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে, সেই ওভারকোটের কলার কাঁধের ওপরে তুলে। চারদিকে তখনও আবছা অন্ধকার, লাল-সুরকির পথটা থেকে জুতোয় শিশির জড়িয়ে যাওয়া, মাঠের তীক্ষ্ণ বাতাসে কড়াইশুঁটি, ছোলাশাক আর কেটে নেওয়া ধানখেত থেকে ভিজে খড়ের গন্ধ। পায়ের শব্দে পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া করে সামনে থেকে একটা সজারুর পালিয়ে যাওয়া। প্রথম দিকটায় যতখানি বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, এখন আর ঠিক সে-রকম মনে হচ্ছে না। বরং এই শীতের সকালে এমনভাবে একা একা হেঁটে যেতে তার চমৎকার লাগছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে সুধাকে।

সুধা। সেই মেয়েটা! কাঁকড়াবিছের সঙ্গেই বোধ হয় তুলনা করা চলে।

অমন একটি শয়তান মেয়ে বাংলা দেশে আর ছুটি জন্মেছে কিনা সন্দেহ। পরনে নীল ইজের, গায়ে ময়লা ছিটের ফ্রক, আর রুক্ষ চুলভর্তি একরাশ বালি। এই মেয়েটির জীবনে বোধ হয় একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল। সে হল সিতাংশুকে মার খাওয়ানো।

না হলে কী করে তার টেবিলের দেরাজ থেকে সিগারেট দেশলাই বাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল ? আর তার ফলে যে-কটি চাঁটি তার মাথায় পড়েছিল, তাদের যে-কোন একটিই ঘিলুগুলোকে নড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পিছন থেকে আচমকা চেয়ার কিংবা মোড়া সরিয়ে নিয়ে তাকে ধপাস করে মাটিতে ফেলে দিয়ে একটি স্বর্গীয় পুলক লাভ করত এই মেয়েটি। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন বাগান থেকে কাঁটাল চুরি করার খবর বাগানের মালিকের কিছুতেই পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না—যদি সুধার তাতে কোন কৃতিত্ব না থাকত।

কতদিন হিংস্র ক্রোধে সিতাংশুর মনে হয়েছে, শাদা শাঁকচুন্নির মত ওই হ্যাংলা শুঁটকী মেয়েটার সে গলা টিপেই শেষ করে দেবে। কিন্তু গলা টেপা তো দূরের কথা, সুযোগ বুঝে কান পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছে কি 'চ্যাঁ' করে আকাশ-ফাটান আর্তনাদ তুলেছে সুধা।

"মাসিমা, সিতুদা আমাকে মেরে ফেললে—"

মা'ও তেমনি। স্বজাত ত, পক্ষপাত থাকবেই। সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে একটা খুন্তি নিয়ে তাড়া করেছেন সিতাংশুকে। অগত্যা খিড়কির দোর দিয়ে এক লাফে সিতাংশুকে এক মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সুধার এক নিঃসন্তান মামা এলেন কাশী থেকে। সুধাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে। তাঁর কাছে রাখবেন, লেখাপড়া শেখাবেন।

এদিকে তখনও টমটমের চল হয়নি, গোরুর গাড়ি যাতায়াত করত। সুধা যখন স্টেশনে রওনা হয়ে গেল মামার সঙ্গে, তার মা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিলেন, তখন সিতাংশু, বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এল।

তাকে দেখেই পরম আনন্দে সুধা কালীর মত জিভ বের করে ভেংচে দিলে।

সিতাংশুর হাড় জ্বলে গেল। দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "দূর হ মুখপুড়ী। যমের বাড়ি চলে যা। আর আসিসনি।"

সঙ্গে সঙ্গে কানে এক প্রকাণ্ড মোচড়। মা।

"মেয়েটা বিদেশে যাচ্ছে, এমন সময় শাপমন্যি দিতে এল! হতভাগা বাঁদর কোথাকার! একটু আক্কেল-পছন্দও নেই?"

সুধা বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসতে লাগল, আর ঘটনাস্থল থেকে দ্রুতবেগে সরে এল সিতাংশু। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, "কাশীর ট্রেনে একটা কলিশন হ'ক, সুধা মরে শাঁকচুন্নি হয়ে যাক। অবশ্য ওর মামার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সে-ভদ্রলোক মানুষ ভালো।"

তারপর—

তারপর দশ বছর পার হল। তের বছরের সিতাংশু এখন তেইশ, এবার সে এম. বি. বি. এস. পরীক্ষা দিয়েছে। ন' বছরের সুধা এখন উনিশ, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।

এর মধ্যে সুধা দু-একবার দেশে এসেছিল, কিন্তু সিতাংশুর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে তখন কলকাতায়। মা অবশ্য সুধার কথা তাকে মাঝে মাঝে শুনিয়েছেন। বলেছেন, "সে দস্যি মেয়ে নাকি আর নেই, এখন নাকি সুধা একেবারে অন্যরকম। এখন সুধা নাকি—"

কিন্তু স্বজাতির সম্পর্কে মা-র পক্ষপাতের কথাটা সিতাংশুর জানা আছে। বিশ্বাস করেনি, বলাই বাহুল্য। সুধার নাম শুনলে এখনও তার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

আর সেই সুধাকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে এই শীতের সকালে লেপের কোমল উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে দু মাইল পথ ঠেঙিয়ে তাকে স্টেশনে যেতে হচ্ছে! একেই বলে বরাত!

চতুর্থ সিগারেটটা ধরিয়ে সিতাংশু জোরে পা চালাল। পথটাকে তবুও ভালো লাগছে। এই সকালটায় একটা আশ্চর্য মাদকতা আছে কোথাও। সেই মাদকতায় কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল

সিতাংশু। স্টেশনও আর দূরে নেই। মিনিট পনের আগেই সে পৌঁছবে। আর ট্রেন আসবার আগেই সে চা খেয়ে নেবে এক পেয়ালা। স্টেশনে ছোট্ট স্টল আছে একটা, সেখানে বুনো গন্ধওলা একরকম অখাদ্য কালো চা তৈরি হয়।

স্টেশনের কাছাকাছি আসতে সূর্য দেখা দিল। উঠেছে বোধ হয় খানিক আগেই, একরাশ কুয়াশার জন্যে এতক্ষণ আড়াল হয়ে ছিল। কড়াইশুঁটি আর ছোলার খেতে লাল রোদ ঝলমলিয়ে উঠল, ঠাণ্ডা তীক্ষ্ণ হাওয়ায় কোথা থেকে একটুখানি মিষ্টি আমেজ লাগল। সিতাংশুর ঠিক সামনেই লম্বা ল্যাজ নিয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত একজোড়া খঞ্জন লাফালাফি আরম্ভ করে দিল।

ভালো লাগা উচিত নয়, তবু সিতাংশুর বেশ লাগল। ভালো লাগল এই সকালকে, এই শীত-ভাঙান রাঙা রোদকে, এই খঞ্জনের নাচকে, এই দু মাইল মর্নিং ওয়াককে। কিন্তু—

কিন্তু। সুধা। বিরক্তমুখে টমটমগুলোর পাশ কাটিয়ে সিতাংশু স্টেশনে এসে ঢুকল।

স্টেশন ছোট। প্ল্যাটফর্ম ছোট। একটা কাঠের আলমারি, একটুকরো ময়লা টেবিল আর একখানা জীর্ণশীর্ণ বেঞ্চি নিয়ে চায়ের স্টলও ছোট। ধুলোয় আবদ্ধ কাচের বোয়ামে খানকয়েক গোলাকার বাদামী রঙের বিস্কুট। একটা তোলা উনুনে আলকাতরার মতো কালো কেট্‌লি। এমন কি, এগুলোকেও তার খারাপ লাগছে না। কেবল—কেবল সুধা যদি না আসত।

সিতাংশু ভ্রূকুটি করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। হাফপ্যাণ্ট আর ছেঁড়া স্লিপ্‌-ওভার পরা ছোকরাটাকে বলল, "চা দে এক পেয়ালা।"

"বিস্কুট ?"

"না। শুধু চা।"

লোহার হাতায় খানিকটা গরম জল, চায়ের রঙধরা ন্যাকড়া, বুনো ধুতরো পাতার কুচির মত গুঁড়ো চা, ফুলকাটা কাচের গ্লাসে

দুধ চিনি মেশানো সেই অপরূপ পদার্থ। কিন্তু চায়ের গুণাগুণ ভাববার মত মনের অবস্থা নয় সিতাংশুর। মাঝে মাঝে এক-একটা করে চুমুক দিতে দিতে সে সুধার কথা ভাবতে লাগল।

সুধা বড় হয়েছে এখন। এবং খুব সম্ভব আরও সাংঘাতিক হয়েছে এতদিনে। ন বছর বয়সেই যে-মেয়ে অত বিপজ্জনক ছিল, এখন সে যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা কল্পনাও করা যায় না। এখন তার দুষ্টুমি কোন্ পথ ধরবে? সিতাংশুকে জব্দ করবার জন্যে এখন কী কী করতে পারে সে?

চায়ের বদলে চিরতার জল খাওয়াতে পারে। গাছকোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারে। রাত্রিতে ঘরে ঢুকে মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে—

কী সর্বনাশ—মশারিতে আগুন! কল্পিত দুশ্চিন্তায় চমকে উঠল সিতাংশু, একরাশ চা চলকে পড়ল ফুলকাটা কাচের গ্লাসটা থেকে। মানুষকে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা। কিন্তু সুধার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সে সব পারে। অন্তত সিতাংশুর ক্ষেত্রে ত নিশ্চয়ই।

খেজুরের নলেন রস, নতুন গুড়ের পায়েস, মায়ের হাতের কড়াইশুঁটির কচুরি আর গল্‌দা চিংড়ির মুড়ো ভাজা, সব কিছু একসঙ্গে বিস্বাদ হয়ে গেল সিতাংশুর মুখে। এর পরে একমাত্র উপায় আছে। পালান। সুধা এসে ভালো করে রাজত্ব শুরু করার আগেই কলকাতার গাড়িতে চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালান।

কিন্তু একটা মেয়ের ভয়ে শেষে পালাবে সিতাংশু? যে-সিতাংশুর বয়েস তেইশ বছর, যে এবার ফাইন্যাল এম-বি-বি-এস পরীক্ষা দিয়েছে? সিতাংশুর আহত পৌরুষ গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার খানিক চা চলকে পড়ল, পড়ল ধুতির উপরে।

"দুত্তোর—"

ঠক করে কাঠের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। আর

প্রায় ছুড়ে দিলে একটা একআনি। চায়ের দাম। তারপর পঞ্চম সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে লাগল দার্শনিকের মত।

ঠুনঠুন করে ঘন্টি পড়ল। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে জড় হতে লাগল যাত্রীরা। সকালের লালচে আলোয় তাদের ছায়াগুলো সিতাংশুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। চায়ের স্টলের পাশে ছোট পেঁপেগাছটায় একটা কাক খুব জরুরী গলায় ডেকে উঠল। যেন ট্রেনটা আসার সঙ্গে তারও কোন একটা সম্পর্ক আছে।

সিতাংশু উঠে এল। এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে।

পায়ের একটু তলায় সিগন্যালের নীল তার থর থর করছে। লাইনের বাঁকের মুখে সাদা পাখাটা ঝুলে পড়ল। কালো এঞ্জিনের মুখটা লোহার বলের মত গড়িয়ে আসছে, অল্প অল্প ধোঁয়া কাঁপছে তার উপরে, ঝোড়ো হাওয়ার মত শব্দ উঠছে খানিকটা। দু পা পিছনে সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিতাংশু।

ট্রেন এল।

ভেবেছিল সুধাকে সে খুঁজবে না, কিন্তু কখন আস্তে আস্তে গাড়ির পাশ ধরে যে এগিয়ে চলল নিজেই জানে না। তারপর দেখতে পেল একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে সুধা নামছে।

সুধাই। এই ছোট স্টেশনে, দুটি চারটি সাধারণ পাড়াগাঁয়ের যাত্রীদের ভিতরে এ মেয়েটি আর কে হবে সুধা ছাড়া?

ফর্সা, দীর্ঘদেহ একটি মেয়ে। গায়ে ফিকে নীল রঙের লম্বা লেডীজ কোর্ট। প্ল্যাটফর্মে নেমে উৎসুক চোখে কাকে যেন খুঁজল। তারপর ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজেই একটা সুটকেস আর বিছানা টেনে নামাবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুধা যা-ই হোক, এ-অবস্থায় সাহায্য না করা কাপুরুষতা। সিতাংশু এগিয়ে গেল। বললে, "সরো, আমি দেখছি।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সুধা তাকাল। কিন্তু কিছু বলবার

আগেই সিতাংশু টেনে নামিয়ে ফেলল বাক্স বিছানা দুটো। আর একটা বেতের ঝুড়ি।

“এই ত ? আর কিছু নেই ?”

“না।” সুধা দুটি কালো চোখের কুণ্ঠিত দৃষ্টি ফেলল সিতাংশুর মুখে, “কিন্তু আপনি—”

“আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি সিতাংশু।”

“সিতুদা !” হঠাৎ সুধার মুখ ঝলমল করে উঠল।

অনাগত সমস্ত বিভীষিকাকে প্রাণপণে অস্বীকার করবার প্রয়াসে সিতাংশু সহজ হতে চাইল। বললে, “সিতুদাই বটে। তোমার ছেলেবেলার এনিমি নাম্বার ওয়ান। মনে পড়ছে না ?”

সুধার দুই গাল মুহূর্তের মধ্যে রাঙা হয়ে উঠল। লজ্জায় বুজে এল চোখের পাতা। চাপা ভীরু গলায় সুধা বললে, “ছিঃ—ছিঃ—সে-সব কথা এখনও ভোলনি ?”

নিচু হয়ে সুধা প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কী ভেবে দু-হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরে তাকে থামাল সিতাংশু। তারপর সোজা তাকিয়ে দেখল সুধার মুখের দিকে। চোখের পাতা দুটো কাঁপছে, গালে লালের রঙ, লম্বা ট্রেন-জার্নিতে রুক্ষ চুলগুলো থেকে মৃদু মিষ্টি গন্ধ। সুধার মুখের উপর সকালের রোদ একাকার হয়ে গেল, শীতের ভিজে-ভিজে সবজি-খেতের ছায়া পড়ল সুধার চোখের পাতায়, শিশিরের গন্ধ জড়িয়ে গেল তার চুলের গন্ধের সঙ্গে।

সিতাংশু তাকিয়ে রইল। ঠিক। সে-সব কথা ভোলা উচিত এখন। দশ বছরে অনেক বদলে যায় সব কিছু।

আর তখনি আর একটা সত্য বুঝতে পারল সিতাংশু।

বুঝতে পারল কেন এই শীতের ভোরে দু মাইল পথ হেঁটে আসতে তার খারাপ লাগেনি।

সারাটা সকালের আলো হাওয়া আর গন্ধ তার রক্তের মধ্যে নিঃশব্দে খবর দিচ্ছিল।

তেইশ বছরের সিতাংশুর কাছে সবচেয়ে দরকারী খবর।

সে খবর শুধু এইটুকু ঃ সুধার বয়স এখন উনিশ বছর।

বেওয়ারিশ কুকুর। রাস্তার কোন অকুলীন নেড়ীর অন্যতম সন্তান। ওর ভাইবোনেরা যখন রোঁয়া উঠে শুকিয়ে মরে গেছে, কিংবা গাড়ির তলায় চাপা পড়ে দিব্যগতি লাভ করেছে, তখন কোন্ মন্ত্রে জোয়ান আর তাজা হয়ে বেড়ে উঠেছে ভুলুয়া।

এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে কেন যে এই রাস্তার মাথায় সে বাসা নিয়েছে, সেকথা শুধু ভুলুয়াই জানে। দিনের বেলা ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পরেই এখানে এসে বসে পড়ে প্রহরীর মতো। তখন চেনা মানুষকেও বেশ শব্দ-সাড়া করে গলিতে ঢুকতে হয়—অচেনা হলে তো পরিত্রাহি অবস্থা। ভুলুয়ার জন্যেই চোর ঢুকতে পায় না রাস্তায়।

ভুলুয়া নাম ওকে কে দিয়েছিল, কেউ জানে না। কিন্তু এক মুঠো ভাত নিয়ে ভুলুয়া বলে ডাক দিলেই ছুটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। বড় বড় জিভ বের করে খায়, মলিন শাদা ল্যাজটা আনন্দে চট্‌পট করে দোলে, কেমন ভিজে ভিজে চোখ মেলে তাকায় সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে। খাওয়া হলে নিজের চারদিকে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কট্‌কট্ করে গোটাকয়েক এঁটুলি ধরে পিঠ থেকে ; তারপরেই কী যেন একটা জরুরি কাজ তার মনে পড়ে যায়—'ভৌ' করে একটা চাপা ডাক দিয়ে ছুটে যায় সদর রাস্তার দিকে।

ভুলুয়ার ওপর পাড়ার কারো রাগ নেই—এতদিন মন্দিরারও ছিল না। কিন্তু কাল মাঠের পুলের পাশে, শেষ কথাগুলো বলা

হয়ে গেলে, যখন সাইকেলে দ্রুত প্যাড্‌ল করে শিশুগাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিল ননিগোপাল, আর পুলের রেলিং ধরে নীচের বদ্ধ খানিক কালো জলের দিকে তাকিয়ে নিজের রক্তে ঝড়ের ডাক শুনছিল মন্দিরা, তখন হঠাৎ তার ভুলুয়ার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ভুল হয়ে গেছে—সাংঘাতিক ভুল। ভুলুয়ার কথা ননিগোপালকে বলা হয়নি।

ননিগোপাল সর্বসাকুল্যে তাদের বাড়িতে দিন দশেক এসেছে। তাও বিকেলের দিকে—সন্ধ্যার পরে নয়। ভুলুয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। কিন্তু রাত একটার পর যে মুহূর্তে ননিগোপাল তাদের গলিতে পা দেবে, তৎক্ষণাৎ—তৎক্ষণাৎ যা ঘটবে, তা কল্পনা করবারও দরকার নেই। মন্দিরা তা বিলক্ষণ জানে। তিন মাস আগে খবর না দিয়েই বাগচিদের জামাই এসেছিল রাত এগারোটার ট্রেনে। সে বেচারীকে শেষ পর্যন্ত একটা পানা পুকুরের মাঝখান থেকে উদ্ধার করতে হয়েছিল।

মনের সমস্ত রোমাঞ্চকর উন্মাদনা একটা কুৎসিত বাস্তব আতঙ্কে রূপায়িত হল মন্দিরার। রাত একটার পরে রাস্তায় অচেনা ননিগোপালকে দেখে ভুলুয়া যে তাণ্ডব জুড়ে দেবে—সেটা ভাবতেও মন্দিরার রক্ত জল হয়ে এল। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালোতে হবে ননিগোপালকে। ধরা পড়াও আশ্চর্য নয়। তরিপর?

ঘরে এসে আলো জেলে টেবিলে বসল মন্দিরা। পড়বার জন্যে নয়—সেই চিঠিখানা তাকে লিখে রাখতে হবে এ-বেলাই। গুছিয়েই লিখতে হবে একটু। বাবা দুঃখ পাবেন, মা হয়তো বিছানা নেবেন কিছুদিনের জন্যে। ভাবতেও বুকের মধ্যে টান পড়ে মন্দিরার। একবারের জন্যে মনে হয়, থাক—এভাবে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে লাভে নেই। পড়বে, পরীক্ষা দেবে—স্কুল

ছেড়ে ভর্তি হবে কলেজে, প্রফেসার হবে মেজদির মতো। ননিগোপালকে সে ভুলে যাবে চিরদিনের মতো।

কিন্তু ননিগোপালকে ভুলে যাওয়া! অসম্ভব! তার আগে আত্মহত্যা করবে মন্দিরা। ননিগোপালকে ছেড়ে একদিনও সে যে বাঁচতে পারবে না, একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে।

ঝকঝকে শ্যামবর্ণ চেহারা—চোখেমুখে পরিচ্ছন্ন ছাপ। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ছেলে—ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বিহারের এই শহরে এসে পড়েছে। প্রথম পরিচয়েই বাবা আকৃষ্ট হলেন।

—এখন আর চট্ করে কী করতে পারি তোমার জন্যে? দু-চারদিন অপেক্ষা করো, দেখি কী হয়। আপাতত আমার মেয়েকে একটু পড়িয়ে-টড়িয়ে দাও, গোটা ত্রিশেক টাকা হাত-খরচা দেব।

ননিগোপাল তৎক্ষণাৎ বাবার পায়ের ধূলো নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে। ধরা-গলায় বললে, কী আর বলব, আপনার দয়া চিরদিন আমার মনে থাকবে।

তা মনে রাখল বইকি ননিগোপাল। তৃতীয় দিনেই পড়ানো ভুলে গিয়ে সে মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, চতুর্থ দিনে হাত চেপে ধরল তার। পঞ্চম দিনে মন্দিরা আর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না।

কাকিমার চোখ তো মানুষের নয়—সে যেন শেয়ালের দৃষ্টি। ষষ্ঠ দিনে সব ধরা পড়ল তাঁর কাছে। সপ্তম দিন থেকে বাড়িতে শুরু হল গুঞ্জন। নবম দিনে সেটা বাবার কানে গেল। তারপর দশম দিনে তিনি ননিগোপালকে নিজের সেরেস্তায় ডাকলেন।

আসন্ন ঝড় বুঝতে পেরে দোতলার ছাদে পালিয়ে গেল মন্দিরা, মুখ লুকোলো চিলে-কোঠার ঘরে। কিন্তু বার-লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্ট বাবা নিজের মর্যাদা নষ্ট হতে দিলেন না। পুরো মাসের টাকাটাই ননিগোপালের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমার আর

আসবার দরকার নেই। ভাবছি মেয়েটাকে আমিই 'কোচ্' করব এর পর থেকে।

ছাত থেকে উঁকি দিয়ে মন্দিরা দেখেছিল, বড় রাস্তার মোড়ে মাথা নিচু করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ননিগোপাল। এত দূর থেকে আশ্চর্য রকমের বেঁটে আর সংক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল তাকে।

বাড়ি থেকে চলে গেল ননিগোপাল, কিন্তু মন থেকে গেল না। সেখানে দিনের পর দিন সে তিলে তিলে 'মহতো-মহীয়ান' হয়ে উঠতে লাগল। আর পড়ার টেবিলে বসে প্রত্যেকটি অসহ্য সন্ধ্যায় মন্দিরার মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে একমাত্র ননিগোপালের জন্যেই তার সৃষ্টি হয়েছে। ননিগোপালকে না পাওয়া গেলে তার জীবনের কোন অর্থ নেই।

তারপরে অনেকগুলো নাটকীয় অধ্যায়। চোরের মতো অনেক দেখাশুনো। স্কুলের একটি বন্ধুর সাহায্যে টুকরো টুকরো চিঠির আদান-প্রদান।

টিউশনটা যাওয়ার পরে ননিগোপাল অবশ্য বসে ছিল না—ছোটখাটো কী সব ব্যবসা সে শুরু করে দিয়েছিল। কিছুদিন আগে সে খবর দিয়েছে, কলকাতায় একটা ভদ্ররকমের চাকরি জুটে গেছে তার। এইবার—অতএব পুলের ধারে সেই বিকেল। দুজনের মুখেই বিকেলের রোদের রঙ। হাওয়ার মতো চাপা ফিস্‌ফিসানি।
—রাত একটার পরে আমি আসব। একটা পঁয়ত্রিশে কলকাতার ট্রেন। তুমি তৈরি থেকো।

মনের মধ্যে অনেক আগে থেকেই তৈরি ছিল মন্দিরা—সায় দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। তারপরে রোদটা হঠাৎ ফুঁ-দেওয়া মোমবাতির মতো নিবে গেলে, পুলের নীচে বদ্ধ জলটা আরও কালো হয়ে গেলে আর দূরে সিস্থগাছগুলোর আড়ালে ননিগোপালের সাইকেলটা অদৃশ্য হয়ে গেলে, নিজের রক্তে ঝড়ের ডাক শুনতে শুনতে ভুলুয়ার কথা মনে পড়ে গেল মন্দিরার।

এই গলির বিনিদ্র প্রহরী ভুলুয়া। রাত ন'টার পরে একটি অচেনা মানুষেরও এখানে পা বাড়ানো অসম্ভব।

নিজের হাতে কতদিন ভুলুয়াকে ভাত খেতে দিয়েছে মন্দিরা। ওর গা-টা অত নোংরা না হলে দু-একদিন এক আধবার হাত বুলিয়ে দিতেও আপত্তি ছিল না। আজ অসহ্য জ্বালার সঙ্গে মনে হচ্ছে, খানিকটা বিষ যদি সে কোথাও পেত, তা হলে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে—

কিন্তু কোথায় বিষ পাবে সে—দেবেই বা কে! তার ওপর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা সময় আছে হাতে। দাঁতে দাঁত চেপে টেবিলের সামনে নিশ্চল হয়ে বসে রইল মন্দিরা।

এত কুকুর মরে এখানে ওখানে, ভুলুয়া কি অমর? প্রতি বছর ডোমেরা মস্ত মস্ত লাঠি দিয়ে রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মারে—ভুলুয়াকে কেন ছেড়ে দেয় তারা?

আজ আর কোন উপায় নেই। ননিগোপাল আসবে—ঝড়-বৃষ্টি হলেও সে আসবে। ভুলুয়া যদি অন্য কোন দিকে থাকে তবেই রক্ষা। কিন্তু সে আশাই বা করা যাবে কী করে? এই তিন বছর ধরে প্রত্যেক রাতে সে ভুলুয়ার সতর্ক পাহারা টের পেয়েছে, শুনেছে তার গভীর-গম্ভীর গলার নির্ঘোষ। ঝড়-বৃষ্টি কেন, মহাপ্রলয় হয়ে গেলেও তাকে সে পাহারা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

নিরুপায় ক্ষোভে টেবিলের ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে রইল মন্দিরা। ভুল হয়ে গেল—ভারী ভুল হয়ে গেল। অন্য যে কোন ব্যবস্থা ভেবে দেখতে বলা উচিত ছিল ননিগোপালকে। কিন্তু আর উপায় নেই এখন।

তারপর আস্তে আস্তে একটা অসম্ভব আশা মনের মধ্যে ছড়াতে লাগল তার। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। একটা রাত ভুলুয়ারও ভুল হতে পারে। মন্দিরার অবস্থা বুঝে ভগবান দয়া

করতে পারেন একটি রাতের জন্যে। রাস্তায় যে-কোনো সময় মোটর চাপা পড়ে মরে যেতে পারে ভুলুয়া। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না!

কাগজ টেনে নিয়ে মন্দিরা লিখতে লাগল: 'মা, আমায় ক্ষমা কোরো। ননিদার অবস্থা খারাপ, তার জাত আলাদা। তাই তার সঙ্গে আমার মিলন তোমরা চাও না। কিন্তু মা—'

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পর পর চারখানা কাগজ নষ্ট করে চিঠি শেষ করল মন্দিরা। লিখতে লিখতে কলম থমকে গেল কয়েকবার, মনে হল: নাঃ থাক। চোখের জলে অনেকবার ঝাপ্‌সা হয়ে গেল দৃষ্টি। তবু চিঠি শেষ করল মন্দিরা, না করে তার উপায় ছিল না।

বাইরের হল-ঘরে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজতে মন্দিরা চমকে উঠল। মাত্র নইটা এখন। আরো চার ঘণ্টা বাকী।

পরদিন সকালে যখন চায়ের টেবিলে এসে বসল মন্দিরা, তখন এক সঙ্গে সবাই তার দিকে তাকালেন।

মা সভয়ে বললেন, একি চেহারা তোর মনু? রাতে জ্বর হয়েছিল নাকি?

—হুঁ। —সংক্ষেপে জবাব দিয়ে মন্দিরা একটা চেয়ারে ঘাড় গুঁজে বসে পড়ল।

বাবা বললেন, যা গরম পড়েছিল কাল রাতে, হিট্ ফিভার হওয়া অসম্ভব নয়।

মন্দিরা কোনো জবাব দিল না। নিজের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে এখন। জ্বর! কাল সারা রাত যে তীব্রতম যন্ত্রণায় যে জ্বলেছে—তার সঙ্গে কোন্ জ্বরের তুলনা চলে! নিজের ঘরের কড়িকাঠের আংটায় ফাঁস দিয়েও সে আত্মহত্যা করতে পারেনি—ছাতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চেয়েছে—সাহস হয়নি! শুধু সারা রাত সমস্ত শরীর ধিকি ধিকি চিতার আগুনে

পুড়েছে তার—ভুলুয়া যতবার ডেকেছে, ততবারই যেন এক-একটা ছোরার ঘা এসে বিঁধেছে তার বুকের ভেতরে।

যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তা-ই ঘটেছে।

রাত একটার সময় গলিতে অমানুষিক চিৎকার উঠেছিল ভুলুয়ার। সে চিৎকারের অর্থ জলের মতো সহজ। তারপর রাস্তার দিকে দ্রুত ছুটে গেল ভুলুয়া—যেন কাকে তাড়া করে গেল। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে তার উদ্দাম আর্তনাদ—যেন বিরাট একটা বীরকীর্তি করেছে সে।

বিছানায় পাথর হয়ে পড়ে ছিল মন্দিরা। যা ঘটবার তা-ই ঘটে গেছে। একটা বাজল, দুটো বাজল, তিনটে বাজল। জানলার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে কোনও শিস্ দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল না—ভুলুয়ার তাড়া খেয়ে আর ফিরল না ননিগোপাল।

কাল রাতেই তো কলকাতায় চলে যাওয়ার কথা ছিল ননিগোপালের। চলে গেছে? মন্দিরাকে ফেলেই? অসম্ভব—কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারে না মন্দিরা। আর বিশ্বাস করতে পারে না বলেই কাল রাত্রে সে আত্মহত্যা করতে পারেনি। আশা আছে—এখনো আশা আছে। না হয় দিনের বেলাতেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে এক ফাঁকে। নইলে রাত্রের অন্ধকারে ভুলুয়াকে একটা রুটি বা যা-হোক কিছু ঘুষ দিয়েই সে নিজে গিয়ে হাজির হবে স্টেশনে। এত সহজেই সে ননিগোপালকে ছাড়তে পারবে না—ননিগোপালই কি পারবে?

মা বললেন, জ্বরটা ছেড়েছে তো এখন?

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল মন্দিরা। চুমুক দিলে ঠাণ্ডা বিস্বাদ চায়ের পেয়ালায়। চোখের কোণে আবার জল নেমে আসতে চাইছে। একটা আগুনের চরকি ঘুরছে মাথার ভেতরে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন কাকা। দাঁতন নিয়ে যথাসময়ে

বেরিয়েছিলেন প্রাতভ্রমণে। এসেই সচিৎকারে ঘোষণা করলেনঃ দাদা, তোমার সেই ননিগোপালের কাণ্ড শুনেছ?

যেন গুলী লাগল মন্দিরার বুকে। রক্ত থেমে গেল শরীরে—কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল মুখ।

কাকা বললেন, ওর সব ব্যবসা জোচ্চুরি। মারোয়াড়ীদের কী-সব সাপ্লাই দেবে বলে হাজার আটেক টাকা নিয়েছিল। সে-সব টাকা বেমালুম মেরে দিয়ে কাল রাতে হাওয়া হয়ে গেছে।

মন্দিরার সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল একটা। কাঁপা অবশ আঙুলে টেবিলের একটা কোনা আঁকড়ে ধরল সে। এই মুহূর্তে সবাই কি তাকিয়ে আছে তার দিকে? কাকা-বাবা-মা-কাকিমা—সবাই?

বাবার স্বর যেন অনেক দূর থেকে শোনা গেলঃ আমি আগেই এমনি একটা আন্দাজ করেছিলাম।

আবার কাকার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ কানে এলঃ আরো খবর আছে। লোকটা একটা পাক্কা স্কাউণ্ড্রেল। এখানে আসবার আগে পুরুলিয়ায় গিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পরেই মেয়েটাকে ফেলে তার গয়নাগুলো নিয়ে চম্পট দেয়। তাঁরা থানায় খবর দিয়েছিলেন, আজ সকালেই পুলিশ ওকে ট্রেস্ করেছে। কিন্তু ননিগোপাল ওরফে কল্যাণকুমার—

হুড়মুড় করে একটা আকস্মিক শব্দে সবাই চমকে উঠলেন। চেয়ার থেকে নীচে পড়ে গেছে মন্দিরা—সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্বর ছাড়ল আট দিন পরে। আরও চার দিন পরে ভোরের আলোয় স্কুলের দিকে চলল মন্দিরা। গরমের সময়ে এ-সব অঞ্চলে মর্নিং স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা।

শুধু জ্বরই ছাড়েনি মন্দিরার—চূড়ান্ত সর্বনাশ ছেড়ে গেছে তাকে। কোথায় তাকে নিয়ে যেত ননিগোপাল কে জানে।

কোন নরকের মধ্যে—কোন্ ভয়ঙ্কর পরিণামে! বাঁচিয়েছে, ভুলুয়াই তাকে বাঁচিয়েছে।

কাল রাতেও ভুলুয়ার ডাক শুনেছে মন্দিরা। সেই সজাগ—অতন্দ্র পাহারা। ননিগোপালের মতো কাউকে সে এ-পাড়ায় ঢুকতে দেবে না। শুধু মন্দিরাকে নয়, আরো কতজনকে সে বাঁচিয়েছে, কতজনকে সে বাঁচাবে।

একদিন ভুলুয়াকে বিষ দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। আজ প্রকাণ্ড একখানা পাঁউরুটি মোড়কে ক.ব নিয়েছে সে। রাস্তার মোড়েই পাওয়া যাবে ভুলুয়াকে। ধুলোর ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে রাত্রি জাগরণের ঘুমটা হয়তো পুষিয়ে নিচ্ছে এখন।

ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল মন্দিরা।

ভুলুয়াকে পাওয়া গেল রাস্তার মোড়েই। 'কিন্তু মাত্র দু' মিনিট আগেই ডোমের প্রকাণ্ড লাঠিতে মাথাটা ছাতু হয়ে গেছে তার। রক্তের মধ্যে তার দেহটা অন্তিম আক্ষেপে লুটোপুটি করছে তখনো। হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডোম, তার হাতের লাঠিটা রক্তমাখা। মিউনিসিপ্যালিটির হুকুম হয়েছে রাস্তার কুকুর খতম করবার, এক-একটা মারলে আট আনা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মন্দিরা, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপরই অতলান্ত অন্ধকার। আঁকড়ে ধরবার মতো একটা টেবিলের আশ্রয়ও এবার তার ছিল না।

"লাইফটাকে একেবারে মিজারেব্‌ল হয়ে গেল ভাই—" চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে কথাটা বলে তারাপদ। তারপর পকেট থেকে কাঁচি মার্কা সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে দার্শনিকের মতো। যেন ওই কাঁচিটার ভিতর সে বিশেষ কোনও একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে কোথাও। সংসারটাই কাঁচি হয়ে তার পকেট কেটেছে।

সংসাব না হোক, স্ত্রী ত বটেই। আর স্ত্রী যাকে ঠকায় জীবনে, কী-ই বা অবলম্বন আছে তার? একমাত্র গতি তা হলে বানপ্রস্থ।

তারাপদ ওই বানপ্রস্থ শব্দটাই ব্যবহার করেছিল একবার। তাব উত্তরে এক বন্ধু বলেছিল, "কিন্তু এ-যুগে বনে যাওয়াতে বিস্তর ঝঞ্ঝাট আছে হে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে ট্রেসপাসিঙের চার্জ আনবে।"

তা এসব নেহাত ঠাট্টা-তামাসা। কিন্তু সত্যিই তারাপদর মনে সুখ নেই।

ঠিক কুশ্রী না হলেও তাবাপদব স্ত্রী সুন্দরী নয়। নামটাও সেকেলে—বনমালা। লেখাপড়া শিখেছিল ক্লাশ সিক্‌স্ বা সেভেন পর্যন্ত। একবার তারাপদ স্ত্রীর একখানা চিঠিতে গুণে দেখেছিল ঠিক সাতটা বানান ভুল। মানুষের মনকে দমিয়ে দেবার পক্ষে এতগুলো কারণই যথেষ্ট।

আর একবার চায়ে চুমুক দিয়ে তলানির কালো কালো পাতাগুলো পর্যন্ত এসে তারাপদ থামে। একটা কাঁচি মার্কা সিগারেট ধরায়: "ডাল্—একেবারে ডাল্! একটা ইংরেজী

ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম, একটা বর্ণও বুঝতে পারে না। এমন ভাবে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করল যে, লজ্জায় মরি। এদিকে শখ করে বেশি পয়সার টিকেট কিনেছি। কী বলব ভাই, সামনের সীট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে এমন করে তাকাচ্ছিল যে—”

ব্যাখ্যার আর দরকার হয় না। এ অবস্থায় একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে কেমন করে তাকাতে পারে, সেটা অনুমান করা যায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য ইংরেজী ছবি যে বি-এ পাশ তারাপদও খুব বেশি বোঝে তা নয়—তাকেও অন্যের হাসি দেখেই হাসতে হয়। তবু অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে কি আর তুলনা চলে ?

“পারে কী ?”—সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তারাপদ বলে, “গাধার মত খাটতে। রাঁধছে ত রাঁধছেই। ঝি না এলে নির্বিকার হয়ে এক পাঁজা বাসন মেজে ফেলছে। একটিন কাপড় সেদ্ধ করে নিয়ে বসবে রবিবারের সকালবেলায়। না ব্রেন—না ফাইনার সেন্স। জীবনে স্ত্রী-ই চেয়েছিলুম ভাই—ঝি চাইনি।”

বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। খানিকটা সিগারেটের ছাই উড়ে যায় তার সঙ্গে।

“অথচ বাবার কথায় যদি ভালমানুষের মত বিয়েটা না করে ফেলতুম তা হলে—”

তা হলে কী হত ? গলা নিচু করে একটা কাহিনী বলে তারাপদ। মুখটা বিষণ্ণ হয়ে যায়, নিঃশ্বাস পড়ে বার বার, চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

তখন সে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। টিউশনি করত শোভাবাজারে। ম্যাট্রিক-পড়া একটি মেয়ে।

“কী মিষ্টি চেহারা ভাই। কী সুন্দর গান গাইত ! আর আমি যখন ওকে বাংলা বোঝাতুম, তখন দুটো কালো কালো ডাগর চোখ মেলে কীভাবে যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত !”

দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক এই সময়। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল : 'ভেরি আর্জেন্ট, কাম শার্প।' কারও অসুখ-বিসুখ মনে করে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে ছুটল তারাপদ। গিয়ে শুনল তার বিয়ে!

রাত্রে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, দেখল, ঘরের শিকল বাইরে থেকে তোলা। সকালবেলা চুপি চুপি এসেছিল স্টেশনে—এসে দেখে স্টেশনের স্টলে তার পালোয়ান কাকা বসে চা খাচ্ছেন।

"কিরে, এখানে যে?"

"এমনি—বেড়াতে এসেছিলুম।"

"বাড়ি যা—বিয়ের দিনে বেশি ঘোরাঘুরি করতে নেই।"

অগত্যা বনমালা এল তার জীবনে। কিন্তু মালা নয়—গলার দড়ি। আবার পর পর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস : "সেই থেকে আর শোভাবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে পারি না ভাই। বুকের ভিতরটা করকর করে।"

শোভাবাজারের কাহিনীতে কল্প-কামনার এক পোঁচ রঙ-চড়ানো। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী ছিল, গানের গলাও ছিল মিষ্টি, চোখ দুটিও ছিল ডাগর—কিন্তু তার সেই চোখে আজ যে-অর্থ তারাপদ আবিষ্কার করতে পেরেছে—সেদিন তার সে-কথা মনেও হয়নি। বনমালা যদি জীবনে এসে এমন করে সব কিছুর শেষ না করে দিত, তা হলে ওই চোখ দুটি নিয়ে আজকে গল্প গড়বার কোনও প্রয়োজন হত না তারাপদর। ওটুকু তার আত্মতৃপ্তির উপকরণ।

"কী স্ত্রী-ই পেলাম ভাই! সেদিন আবার এমন এক বোকামো করে বসেছে—"

আর একটা গল্প শুরু করল তারাপদ। আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলে।

স্ত্রীর নিন্দা তারাপদর বিলাসে পরিণত হয়েছে এখন। তার নেশা।

অফিসের বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, "ঘর করো কী করে?"

"ঘর করি না—দিন কাটাই।"

মুখে একটু বেশিই বলে। কিন্তু বাড়িতে ঠিক অতখানি বীতরাগ দেখা যায় না তারাপদকে। শান্ত, নিরীহ মানুষ বনমালা। রাতদিন পরিশ্রম করতে পারে সমানে। নিটোল সুন্দর স্বাস্থ্য—এই পাঁচ বছরে একটা দিন তার মাথা ধরেনি, একদিনও জ্বরে পড়েনি। ঘুম থেকে উঠেই যথানিয়মে চা আর জলখাবার পায় তারাপদ, অফিসের ভাত দিতে একটি মিনিটও দেরী হয় না, প্রতি রাত্রে পরিচ্ছন্ন শুভ্র বিছানাটি ঝকঝক করে। কখনো কখনো মায়াও হয় স্ত্রীর উপর।

"ওকি—সেলাই করা শাড়ি পরেছ কেন ?"

"তাতে আর কী হয়েছে। বাড়িতে কি সেজে গুজে থাকা যায় সব সময় ?"

"তোমার কাপড় নেই নাকি ? বলনি কেন ? কালই এনে দেব এক জোড়া।"

"এখন থাক। এ মাসেই ত আবার ইন্‌শিয়োরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হবে। তুমি ভেব না—আমি চালিয়ে নেব এক রকম।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘন্টাখানেক বই না পড়লে ঘুম আসে না তারাপদর। তার মধ্যেই সব পাট মিটিয়ে কখন এসে নিঃশব্দে পাশে শুয়ে পড়ে বনমালা আর তৎক্ষণাৎ অঘোর ঘুমে তলিয়ে যায়। বই পড়া বন্ধ করে শোয়ার আগে কোনো-কোনোদিন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখে তারাপদ। ঢাকনা-দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পটার খানিকটা ম্লান আলো পড়েছে বনমালার ঘুমন্ত ক্লান্ত মুখের উপর, পাখার হাওয়ায় কপালের কয়েকগাছা রুক্ষ চুল উড়ছে, ভারী অসহায়, ভারী ছোট, ভারী নির্ভরশীল মনে হয় স্ত্রীকে। আরও মনে হয়, বনমালার ভ্রূ তুটি সুন্দর—মুখের গড়নটিও মন্দ নয়, গায়ের শামলা রঙটি কোমল আর চোখ জুড়ানো। তখন আর

এ-কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না : 'লাইফ্‌টা একেবারে মিজারেব্‌ল হয়ে গেছে!'

কিন্তু দিনের আলোর রূপ আলাদা। পথে বেরুলেই অন্যরকম।

কলেজের মেয়েরা চলেছে দল বেঁধে। কী স্মার্ট—কী সুন্দর—কত সহজ চলাফেরা—কী উচ্ছ্বসিত হাসি! ট্রামে-বাসে স্বচ্ছন্দে ওঠা-নামা করছে মেয়েরা, মার্কেটিং করছে। চলন্ত মোটর সাইকেলের পিছনে নির্ভয়ে বসে আছে সালোয়ার পরা একজন—মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বাঙালীর মেয়ে। একটি অল্প বয়েসী মা বাচ্চাকে পেরাম্‌বুলেটারে ঠেলে নিয়ে চলেছে পার্কের দিকে। অফিসের মেয়েদের ত কথাই নেই—টকাটক চলা-ফেরা করছে, টাইপ করছে ক্ষিপ্র আঙুলে, নিঃসংকোচে গল্প করছে সহকর্মীদের সঙ্গে—ঝরঝর করে ইংরাজী বলছে। তখনই মনে হয়, কী নিদারুণ ঠকেছে তারাপদ—তখনই জিভের ডগায় এগিয়ে আসে : "কী যে একটা গবেট্ স্ত্রীর পাল্লায় পড়েছি—"

জ্বালার মধ্যে আরও জ্বালা। অফিসের কাজের ফাঁকে কেউ এসে বলে, "শুনেছ তারাপদ ?"

তারাপদ জিজ্ঞাসু চোখ তোলে।

"আমাদের প্রভাসের বিয়ে হচ্ছে—লাভ ম্যারেজ। গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—খাসা চেহারা—কবিতা-টবিতা লেখে—"

জুনিয়ার ক্লার্ক প্রভাস লাল হয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে যায় তারাপদ। প্রভাসের উপর একটা অন্ধ হিংসা ঠেলে ওঠে মনের মধ্যে। যেন প্রভাস তাকে ঠকিয়েছে—যেন ওই মেয়েটির সঙ্গে তারই বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।

"খুব আনন্দের কথা।" মনে মনে গর্জন তুলে বাইরে হাসতে চেষ্টা করে। বার করে কাঁচি মার্কা সিগারেটের প্যাকেট। আর কাঁচিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, সারা সংসারটাই তার পকেট কেটেছে।

তারপর অফিসের ক্যান্টিন।

"সত্যি বলছি—মধ্যে মধ্যে আমার সুইসাইড্ করতে ইচ্ছে করে! এমন একটা ইডিয়টিক স্ত্রীকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে!"

"ডিভোর্স করো।" কোন হিতার্থী উপদেশ দেয়।

ল-পাশ করা একজন প্রতিবাদ করে।

"কিন্তু কোন্ গ্রাউণ্ডে? স্ত্রী ভালো, লেখাপড়া জানে না—ইণ্টেলেক্চুয়াল্ কম্প্যানিয়ন নয়—এ-সব কথা ত আইন শুনবে না। হয় প্রমাণ করতে হবে স্ত্রী লুনাটিক—নইলে ডিজিজ্‌ড্—নইলে ক্যারেক্টার—"

শেষ কথাটার কদর্য স্থূলতা তারাপদকে আঘাত করে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় শান্ত নিরীহ বনমালার ঘুমন্ত ক্লান্ত মুখ তার মনে পড়ে। ময়লা শাড়ির আঁচলটা সেলাই করা—এ-মাসে ইন্‌শিয়োরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হবে বলে কাপড় কিনতে চায়নি। তৎক্ষণাৎ নিজেকে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ—অতিশয় ইতর বলে মনে হয়। কুণ্ঠিত হয়ে চোখ নামিয়ে আনে চায়ের পেয়ালায়।

কিন্তু নেশার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। স্ত্রী-নিন্দার বিলাসটা কিছুক্ষণের ভিতরেই আবার পেয়ে বসে তাকে।

"কলেজে যখন রোম্যান্টিক কবিতা পড়তুম—তখন কত স্বপ্নই চোখে ছিল! এমনভাবে সব মিথ্যে হয়ে যাবে সে কি কোনোদিন ভাবতেও পেরেছি! মানুষের জীবনে স্ত্রী একটা অ্যাসেট্—একটা ইন্‌স্পিরেশন। আর আমি কাঁধের উপর একটা ধোবার মোট টেনে চলেছি—যতক্ষণ হাত-পা ভেঙে মাটিতে বসে না পড়ব—ততক্ষণ এর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই!"

"আর শোভাবাজারের সেই মেয়েটি।" কল্প-কামনাকে ফেনিয়ে তুলতে তুলতে তারাপদ বলে, "মুখ ফুটে কিছু বলেনি ভাই, কিন্তু

তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, কত কথাই লুকিয়ে রয়েছে তার ভিতর।”

সেই ধোবার মোট টেনেই সেদিন ফিরছিল তারাপদ। বড় শালীর ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল বেহালায়। রাত সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছল এস্প্লানেডে।

বাস আসতে দেরি হচ্ছে। ওদিকে আকাশ থম থম করছে বৃষ্টির কালো মেঘে। ফাঁকা হয়ে এসেছে চৌরঙ্গী। ভীত আর জড়োসড়ো হয়ে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বনমালা।

ঠিক সেই সময় এল ট্যাক্সিটা। একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

“হ্যালো ভট্চায !”

ট্যাক্সির ভিতর থেকে নেশায় জড়ানো সম্ভাষণ। অফিসের কাঞ্চন চৌধুরী। অনেককে টপ্কে প্রমোশনের লিস্টে হঠাৎ অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। অপরিচ্ছন্ন রুচি, নোংরা ইয়ার্কি। ওর কথা শুনলে কান ঝাঁ ঝাঁ করে, অথচ কথা শোনবার লোভও সামলানো যায় না।

তারাপদ ভুরু কোঁচকালো। কাঞ্চন চৌধুরী ড্রিঙ্ক করে এসেছে।

“কোথায় গিয়েছিলে চৌধুরী ?”

“বার থেকে বেরুলুম এইমাত্র। বাড়ি ফিরছি—দেখি তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে। তা সঙ্গে এটি কে ? দিস্ শাই বিউটি ?”

শুকনো ঠোঁট চাটল তারাপদ।

“আমার স্ত্রী।”

“ও—তোমার সেই অ্যাকার্সড্ ইডিয়টিক ওয়াইফ ? তা দাও না আলাপ করিয়ে ! দেখি, মিসেস্ ভট্চাযকে ইন্টেলিজেন্ট্ করে তোলা যায় কি না।”—একটা অশ্লীল হাসিতে বক্তব্যকে বিশদ করে তুলল চৌধুরী।

তৎক্ষণাৎ—সেই মুহূর্তেই আত্মদর্শন হল তারাপদর! স্ত্রীকে নিন্দা করবার বিলাসিতায় বনমালার মর্যাদাকে—তার নিজের সম্মানকে এ-কোথায় সে নামিয়ে এনেছে! সহকর্মীর স্ত্রীকে—একটি ভদ্রঘরের মেয়েকে এমন কুৎসিত অপমান করবার অধিকার কে দিয়েছে চৌধুরীকে! পুরো মাতাল হয়েও আর কারো স্ত্রীকে এমন কথা বলতে পারে চৌধুরী? পায় সাহস?

পাশে দাঁড়িয়ে ভীরু পাখির মত কাঁপছে বনমালা—স্পষ্ট অনুমান করল তারাপদ। তারপর হঠাৎ আস্তিন গুটিয়ে নিলে হাতের। জীবনে এই প্রথম স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে এল সে। এই প্রথম বার।

“শট্ আপ ইডিয়ট!” বাঘের মত গর্জন করে কাঞ্চন চৌধুরীর কদর্য হাসিটাকে থামিয়ে দিয়ে তারাপদ বললে, “এক ঘুষিতে দাঁত ক'টা উড়িয়ে তোমায় শিখিয়ে দেব, কোনো ভদ্রমহিলার সামনে কিভাবে বিহেভ্ করতে হয়!”

আমি ছেলেবেলায় একজন খুনীকে দেখেছিলুম।

তাকে দেখবার আগে পর্যন্ত খুনী সম্বন্ধে আমার মনে কোনো স্পষ্ট চেহারা ছিল না—যা ছিল তা সেই বয়সের অদ্ভুত, অর্থহীন আর অতলান্ত একরাশ ভয়। গোধূলির লাল রঙ মুছে গেলে আমাদের বাড়ির জংলা আমবাগানে জমাট ছায়ার ভিতরে যখন 'নিম নিম' করে প্যাঁচা ডেকে উঠত, তখন সেই ভয়ের চমকে আমি কোথায় কোন্ রক্তপাগল হত্যাকারীকে অনুভব করতুম; অনেক রাতে হঠাৎ ভাঙা ঘুমের মধ্যে শুনতে পেতুম বাইরে অস্বাভাবিক কুশ্রী স্বরে কুকুর কাঁদছে, তখন আমার মনে হত, সে বোধ হয় কোনো খুনীকে দেখতে পেয়েছে। বর্ষার রাতে বাইরে থেকে দমকা হাওয়া এসে ঘরের নিবু-নিবু লণ্ঠনটার আবছা আলোকে যখন থেকে থেকে কাঁপিয়ে দিত—তখন আলোর সেই কাঁপনের সঙ্গে সঙ্গে কোনায় কোনায় ছায়াগুলো কোনো অপেক্ষমান খুনীর মত সন্তর্পণে নড়ে বেড়াতে।

সেই খুনীকে আমি দেখতে পেলুম। আর কী আশ্চর্য—একেবারে দিনে-দুপুরে। আরও আশ্চর্য, সেই খুনীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলল চৌধুরীদের প্রভা বউদি। রোগা লিকলিকে ফ্যাকাশে মানুষ, কোলে-পিঠে পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে, তার উপরে আবার তার ফিটের রোগ ছিল। চৌধুরী-বাড়িতে খেলতে গিয়ে আমরাই তো কতবার দেখেছি—হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়ছে প্রভা বউদি, দাঁতে দাঁত আটকে গেছে, আর মাসীমা, মানে

প্রভাবতীর শাশুড়ী, জোর করে বউদির হাতের মুঠো খুলে দেবার চেষ্টা করছেন।

সেই প্রভা বউদিই খুনীকে ধরে ফেলল।

দুপুর বেলা মেশোমশাই কোর্টে গেছেন। সুধীনদা—প্রভা বউদির স্বামী—পি. ডব্লু. ডি র সায়েবের সঙ্গে ট্রলি চেপে রেললাইন দেখতে বেরিয়েছেন। প্রভা বউদিরও একটু ঘুম এসেছে—হঠাৎ রান্নাঘরে বাসন নাড়বার আওয়াজ পেল।

খুব বুদ্ধি কিন্তু বউদির। কান খাড়া করে শুনেই বুঝল—এ বেরালের কীর্তি নয়, মানুষ। পা টিপে-টিপে বউদি এসে রান্নাঘরে উঁকি মারল। কালো একটা বিশ্রী চেহারার লোক, ভাতের হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে—

লোকটা বউদিকে দেখে চমকে ওঠার আগেই বউদি দিয়েছে দরজা বন্ধ করে—শক্ত করে শিকল দিয়েছে এঁটে। তারপরেই আকাশফাটান চিৎকার ঃ চোর-চোর—রান্নাঘরে চোর ঢুকেছে—

ভাগ্যিস, চোর ভেবেছিল! খুনী জানলে কী আর শিকল বন্ধ করতে পারত? দাঁতকপাটি লেগে তক্ষুনি ফিট হয়ে পড়ত মাটির উপর।

তারপরে পাড়ার অনেকে জড় হল। রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে সেই পট্‌লাদাই লোকটাকে টেনে বের করে আনল—যে-পট্‌লদা ড্রামাটিক ক্লাবে ফিমেল পার্ট করে।

তখনও কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। একেবারে কিচ্ছু না।

এতটুকু বাধা দেয়নি লোকটা। হাত ধরে যখন পটলদা তাকে টেনে আনল, তখন সে সুড় সুড় করে বেরিয়ে এল সেই সঙ্গে। সাহস পেয়ে পটলদা যখন তাকে একটা চড় মারল, তখনও কোন সাড়াশব্দ করল না। তারপরে সবাই মিলে আরম্ভ করল দু-হাতে। শেষ পর্যন্ত পেটে একটা লাথি খেয়ে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে লোকটা যখন মাটিতে বসে পড়ল, তখন ভয় পেয়ে সবাই মার বন্ধ করল।

কিন্তু এত মার, এত নির্যাতন, লোকটার মুখে একটাও কথা নেই।

তখন হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে এল সকলের।

“লোকটা পাগল নয় ত ?”

“আর বোবা। একটা কথাও তো বলছে না।”

চাপা অনুতাপের ঢেউ বয়ে গেল একটা। দুটোই সম্ভব।

কেউ কেউ তখনও আশা ছাড়েনি। তারা বললে, “ও-সব বাজে কথা মশাই—পাগলও নয়, বোবাও নয়। মিচ্‌কে শয়তান। মুখ বুজে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে। বেশ ভালো করে আরও ঘা-কতক বসিয়ে দিন, এখুনি বুলি ফুটবে।”

ওই বলা পর্যন্তই। ওর গায়ে আর হাত উঠল না কারুর।

মাসীমার দয়া হয়েছিল। কোমল গলায় বললেন, “আহা—লোকটা বোধ হয় ভিখিরি। ক’ দিন খেতে পায়নি—তাই ভাত চুরি করতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। তোরা মিছিমিছি ওকে এমন করে মারলি !”

ভিখিরি ! তা-ও হতে পারে। এতক্ষণে যেন সবাই নতুন করে চেয়ে দেখল তার দিকে। লোকটার পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়—পাঁজরা বের করা হতচ্ছাড়া চেহারা, মাথার রুক্ষ চুলগুলো জটাবাঁধা, মুখে বিশৃঙ্খল দাড়ি। কয়েক দিন অন্তত কিছু যে খেতে পায়নি, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ময়লা মার্বেলের মত দুটো ঢ্যালা-পাকানো চোখ, মুখের চারপাশে শাদা শাদা আঠার মত কী লেগে রয়েছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই মাসীমা আবার বললেন, “মারধোর ত অনেক হল, এবার ছেড়ে দে ওকে। আমি বরং দুটো মুড়িগুড় ওকে খেতে দিই।”

থানা আমাদের পাড়ার কাছে। কে যেন সেখানে এর মধ্যেই খবর দিয়ে এসেছিল। থানার জমাদার মনসুর মিঞা আর

কনস্টেবল রামভরস এসে হাজির। আমাদের শনিবারে হাফ স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে তখন—চৌধুরী-বাড়িতে চোর ধরা পড়েছে শুনে জমাদার সাহেবের পিছনে পিছনে আমরাও ছুটে এলুম।

মাসীমার মন তখন আরও নরম হয়ে এসেছে। তিনি বলছিলেন, "একে ভিখিরি, তায় বোবা। কথাটি কইতে পারে না বলেই এমন চোরের মার—"

সেই সময় মনস্থর মিঞাকে ঢুকতে দেখে মাসীমা এক গলা ঘোমটা টেনে জিভ কেটে সরে গেলেন।

লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালেন মনস্থর মিঞা। জ্বলন্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর মোটা গলায় বললেন, "এই চোর ?"

মাসীমার প্রভাব তখন সকলের মনের উপরেই পড়েছে। একজন বললে, "আজ্ঞে, চোর নয়—ভিখিরিও হতে পারে।"

মনস্থর মিঞা বললেন, "হুম্ !"

সাহস পেয়ে আর একজন বললে, "হয় ত কতদিন খায়নি—"

"খায়নি নাকি ?" বলেই মনস্থর মিঞা ধাঁ করে আবার একটা প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিলেন লোকটার পেটে ঃ "তবে খা ব্যাটাচ্ছেলে মকবুল—ভালো করে খা !"

"মকবুল !" একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করলে সবাই।

লাথি খেয়ে এইবারে সেই লোকটা পেট চেপে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপরেই হড় হড় করে বমি করে ফেলল একরাশ। কালো, দুর্গন্ধ বমি।

নাকে রুমাল দিয়ে দু পা সরে গেলেন মনস্থর মিঞা।

"ঈশ—কাণ্ড দেখুন ব্যাটার ! পেটের জ্বালায় মাটি খেয়েছে—আর নদীর জল !"

তাই বটে। বমির সঙ্গে বালিমেশান কাদা আর জল বেরিয়ে আসছে—তার উপরে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে লোকটা। আর

ফিট হয়ে গেলে প্রভাবৌদির যেমন হয়—তেমনিভাবে পা ছুড়ছে প্রাণপণে।

পটলদা বললেন, "কী সর্বনাশ—মারা যাবে নাকি ?"

"মারা যাবে!" মনসুর মিঞা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন: "কে মারা যাবে? মকবুল? তা হলে ফাঁসিতে ঝুলবে কে?"

"ফাঁসি!" সবাই চমকে গেল: "তার মানে?"

"মানে—ও ব্যাটা খুনী। ছ মাস ফেরার ছিল—আজ বাগে পেয়েছি বাছাধনকে।"

খুনী! সবাই হাঁউমাউ করে পিছনে সরে গেল। বারান্দার থাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল প্রভা বৌদি, ফিট হয়ে ঠিক মাটিতে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় পায়ের কাছে পাড়ার কালো হুলো বেরালটাকে দেখে সামলে গেল। এই বেরালটাকে ভারী ভয় করে প্রভা বৌদি।

"খুনী!"

"নিজের বিবিকে কেটেছে মশাই। একেবারে মাছকোটার মত টুকরো টুকরো করে। সোজা বস্তু নাকি এটি?"—মকবুলের পিঠে আবার একটা লাথি মেরে বললেন, "নে ব্যাটা—উঠে পড় এখন। আর ভিরমি খেয়ে কাজ নেই।"

মকবুল উঠতে পারল না—রামভরস তাকে টেনে তুলল। ময়লা মার্বেলের মত চোখ দুটো তার তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। মুখে, বুকে—বিশৃঙ্খল দাড়িতে বীভৎস বমির মাখামাখি।

এই খুনী! খুনী দেখতে এই রকম। একটা সাধারণ মানুষ—হাড় জির জিরে চেহারা! কালিমাখা সন্ধ্যায়, আচমকা ঘুমভাঙা রাতের কুকুরের কান্না শুনে, বর্ষার এলোমেলো হাওয়ায় কাঁপন-লাগা লণ্ঠনের আলোয় যার ভয়ঙ্কর একটা দেহহীন ছায়ামূর্তি আমি কল্পনা করেছিলুম—তার সঙ্গে এর কোথায় মিল!

আর তখন—এতক্ষণ পরে মকবুল কথা কইল। ঠিক কথা কইল না—কেঁদে উঠল।

"আম্মা—আম্মা—আমার আম্মা—"

খুনী কাঁদছে! মা বলে কাঁদছে! আমি অবাক হয়ে দেখলুম, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। খুনীরা এই রকম? তাদের চোখ দিয়েও জল পড়ে?

কিন্তু সে-চোখের জলে মনসুর মিঞার মন ভিজল না।

বললেন, "আম্মা? আম্মার সঙ্গে দেখা হবে বইকি। চল্ থানায়। ওঠ্ বলছি—"

তারপর লোকটার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে প্রায় টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেল রামভরস। ছেলেরা পিছনে ছুটল—বড়রাও কেউ কেউ। কেবল আমিই যেতে পারলুম না। কিছুতেই আমার মন বিশ্বাস করতে চাইছিল না। খুনী? খুনী এমন হয়? সে কাঁদে? তার মার জন্যে?

সেদিন সারা রাত আমি যেন ঘুমের ঘোরে তার কান্না শুনলুম। আম্মা—আম্মা—আম্মা—

আরও অনেক বছর পার হয়ে গেছে। কোর্টে জুরী হয়ে আর একজনকে আমরা একবাক্যে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলুম।

ফাঁসির হুকুম হল।

কাঠগড়া থেকে নেমে যেতে যেতে সে উকিলকে বলেছিল, "আপীল করে কী আর হবে—আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের একটু দেখবেন!"

মা—স্ত্রী—সন্তান! সেই মকবুলের গলা!

অথচ, আমি একটা খুনীর মুখ দেখতে চাই। রাত্রির অন্ধকারে—দুর্যোগের ভিতরে যে নৃশংস নির্মম সত্তা ছায়ামূর্তি হয়ে ঘুরে বেড়ায়—তাকে দেখতে চাই।

আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত একজন খুনীকেও আমি খুঁজে পেলুম না!

জানলা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় আকাশটাকে। সেই অনেক দূর যে কতখানি, একদিন সন্ধ্যেবেলা ঈজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে ঘাড়টা একটুখানি বাঁকিয়ে তা লক্ষ্য করেছিল জয়ন্ত। অনেক উঁচু দিয়ে পশ্চিমমুখো এরোপ্লেন যাচ্ছিল একখানা। লাল আর সবুজ দুটো আলো পর পর জ্বলছিল, নিভছিল। তারপর প্লেনের আওয়াজ মিলিয়ে গেলেও একটা লালচে আলোকে আরও বহুক্ষণ দেখেছিল জয়ন্ত। সেটা ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হল, কয়েকটা তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে চিনে নেওয়া শক্ত হল তাকে; তারও পরে একটা ইলেক্‌ট্রনের বিন্দুর মত থেকে থেকে চিকচিক করতে লাগল।

ঘাড়টা টনটন করে উঠল, চোখে জল এসে গেল। নইলে আরও কিছুক্ষণ দেখতে পাওয়া যেত।

তেতলার ঘর। সামনের পার্কটার ওপারে যে-সব বাড়ি উঠেছে সেগুলির একটিও অভ্রভেদী নয়। তাই অনেক—অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখতে পাওয়া যায় জানলা দিয়ে। মেঘগুলো ভেসে যেতে জয়ন্তের চোখের সামনেই তিন-চারবার চেহারা বদলায়; কাটা ঘুড়িগুলোর মাতালের মতো টলতে টলতে নেমে পড়া পর্যন্ত দেখা যায় প্রায়ই; দুপুরের রোদে পায়রার ঝাঁক সাঁতার কাটে—তাদের শাদা কালোর ঝলক যতক্ষণ খুশি দেখতে পারে জয়ন্ত।

আজও, সকালের চায়ের পরে, সেই ঈজিচেয়ারে তেমনি করে এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে আকাশটার কথা ভাবছিল না, কারণ কোলের উপর পড়ে ছিল খবরের কাগজটা।

ভারত-পাকিস্তান সমস্যা মাথার মধ্যে ঘুরছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল, একটা হেয়ার ক্রীম না কিনলেই নয়—অথচ তিন দিন ধরে ক্রমাগত ভুল হয়ে যাচ্ছে।

এলা এল সেই সময়। একটা সুতো ধরে জানলাটার মাপ নিতে আরম্ভ করল।

"ও কী করছ ?"

"পর্দার মাপ নিচ্ছি।"

"পর্দা কী হবে ?"

জয়ন্তের কপালের উপরে নেমে আসা একগুচ্ছ কোঁকড়া চুলকে আল্‌গা ছোঁয়ায় সরিয়ে দিলে এলা। তারপর বললে, "পর্দা দিয়ে কী হবে ? কেন—জানলায় টাঙান হবে।"

চমকে উঠল জয়ন্ত।

"না—না, পর্দার দরকার নেই। আকাশটা ঢাকা পড়ে যাবে। আলো আসবে না।"

এলা হাসল, "আকাশ ঢাকা পড়বে কেন ? নীচে অনেকটাই খোলা থাকবে—এই চেয়ারটায় বসে স্বচ্ছন্দে দেখতে পাবে তুমি। আলোও আটকাবে না।"

একটু চুপ করে রইল জয়ন্ত। হয়ত আলো আটকাবে না ; হয়ত আকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। তবু সবটুকু আলো আসবে না—পর্দা যতই স্বচ্ছ হোক তবু সে আলোকে খানিকটা ম্লান করে দেবেই। আকাশ আধখানা হয়ে যাবে—মেঘেদের রূপ-বদল দেখা যাবে না পুরোপুরি—পায়রার ঝাঁক একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাবে।

"কিন্তু পর্দা না দিলে কী হয় ?"

এলার মাপ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। বললে, "ঘরটা কি রকম ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়, বিশ্রী লাগে। আর—"

"আর ?"

"সামনের বাড়িগুলো থেকে ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। কাপড়চোপড় ছাড়তে ভারী লজ্জা করে।"

জয়ন্ত বললে, "কী আশ্চর্য! অতদূর থেকে আমাদের ঘরের ভিতরটা দেখতে পায়? আর তা ছাড়া দরকারের সময় জানলা বন্ধ করে নিলেই ত হয়।"

এলা ভুরু কোঁচকাল।

"একবার জানলা বন্ধ কর, একবার খোল—রাতদিন ওই করি আর কি! দেখ না—কী সুন্দর পর্দা লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে। টুনিদিদের ওখানে যে রকম দেখে এসেছি, ঠিক তেমনি। ঘরটার চেহারাই খুলে যাবে।"

জয়ন্ত কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বেরিয়ে গেল এলা। যেতে যেতে বলে গেল, "ডাল পুড়ে যাচ্ছে আমার।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়ন্ত। এই বাড়িতে আসবার পর তিন মাস ধরে জানলাটা খোলা আকাশের খবর বয়ে আনছে। পর্দা টাঙিয়ে তাকে বিষণ্ণ করে দেবার কথা এলার মনেও হয়নি। পার্কের ওপারে দূরের বাড়িগুলোও বিন্দুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি করেনি এতদিন। এর মূলে আছে এলার মামাত বোন টুনিদি। পরশু তার ওখানে ওদের নেমন্তন্ন ছিল।

মেয়েদের কল-কাকলীতে বিশেষ কাজ ছিল না জয়ন্তের, সে টুনিদির আট বছরের ছেলে বিট্লুর সঙ্গে ক্যারাম খেলছিল। তবু যেন ওর মধ্যেই দূরে একবার শুনতে পেয়েছিল, "কোত্থেকে এনেছ? মার্কেট? তাই বলি—মার্কেট নইলে কি এমন পছন্দসই জিনিস পাওয়া যায়? সত্যি—কী সুন্দর রঙ! এত মানিয়েছে যে—"

আড়াই শ টাকা মাইনের জয়ন্তের সঙ্গে মার্কেটের সম্পর্ক এত কম যে কথাগুলো ভালো করে শোনবার দরকার ছিল না। তা ছাড়া সব জিনিসেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ভদ্রতা করবার একটা স্বাভাবিক

সৌজন্য মেয়েদের আছে। এই এলাই কাদের বাড়িতে গিয়ে খুব খুশি হয়ে বলেছিল, "ইস্—কী লাভলি বেড়ালের বাচ্চাগুলো!" অথচ জয়ন্ত জানে, এলা দু-চক্ষে বেড়াল দেখতে পারে না।

কিন্তু টুনিদির পর্দা যে সত্যিই এলাকে এমনভাবে বিচলিত করবে, জয়ন্ত তা ভাবতে পারেনি।

কিছু নয়—ওটা খেয়াল। অথবা প্রত্যেক গৃহিণীর অন্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রতিযোগিতা। অথচ পরশুর আগে পর্যন্ত এই জানলায় পর্দা টাঙানর কোনও দরকার ছিল না এলার—সামনের বাড়িগুলো সম্পর্কে এতটুকুও সংকোচের কারণ ঘটেনি। আজ নিজের খেয়ালটাকে মেটানর জন্যই তাকে এত সব কারণ আবিষ্কার করতে হচ্ছে।

কিন্তু এলা কি জানে, ওই জানলায় আড়াল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি আকাশ, কতখানি মুক্তি ঢাকা পড়ে যাবে জয়ন্তের? সেই ক্ষতির পরিমাণটা কি আন্দাজ করতে পারবে এতটুকুও?

জয়ন্ত আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এক বছরের কিছু বেশি হল বিয়ে হয়েছে। এর ভিতরে এলার সম্বন্ধে এতটুকু অভিযোগের কারণ কোনওদিন ঘটেনি। আশ্চর্য গোছান মেয়ে। নিখুঁত নিপুণ হাতে সাজিয়েছে ছোট সংসারটাকে। ঠিক জানে, কখন জয়ন্তের এক পেয়ালা চা দরকার, জানে কী কী খেতে সে ভালোবাসে। রান্নার হাত সুন্দর—নানা রকম খাবার করতে জানে। বকের পাখার মতো বিছানাটি ধবধব করে, বালিশের ঢাকনায় কখনও তেলের দাগ ধরে না, ফুলদানিতে ফুল কখনও বাসি হয়নি। এক-আধটু এস্রাজ বাজানর শখ আছে, যখন বাজাতে বসে তখন অপরূপ ললিত সে ভঙ্গিটি, এলো করে বাঁধা চুলে, কুঙ্কুমের টিপে, চোখের ঘুমন্ত দৃষ্টিতে তাকে কাংড়া আর্টের ছবির মতো মনে হয়। আবার যখন গাছকোমর বেঁধে ঘরের ঝুল ঝাড়ে, তখনও তার কাজ একেবারে নির্ভুল, পাখার ব্লেডগুলোতে

পর্যন্ত একটুখানি ময়লার রেখা পড়তে পায় না। বিয়ের আগে আই-এ পাশ করেছিল, এখন প্রাইভেট বি-এ দেবার আয়োজন করছে। রোজ রাতে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করে—কোনদিন সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।

ইংরেজীতে বলা যায় পার্ফেক্ট্। ওই শব্দটার বাংলা কী? 'নিখুঁত' বললে ঠিক ভাল লাগে না—কেমন যেন খুঁৎ-খুঁৎ করতে থাকে। এলা পার্ফেক্ট্।

এত বেশি পার্ফেক্ট্ বলেই কি অনেকখানি আকাশের উপর এমন একটা মোহ জয়ন্তের? আকাশটা এলোমেলো। মেঘগুলো খুশিমত ওড়ে, পাখিরা যখন ইচ্ছে আসে যায়, এলোপাথাড়ি ছড়ান থাকে তারারা, চাঁদ রূপ বদলায়, সূর্যের আলোও এক-আধটু দিক বদল করে। অথচ নিজের ঘরে জয়ন্তের সব কিছু নির্ভুল নিয়মে সাজান আছে একেবারে। মাঝরাতে ওঠে ঘুম থেকে—ঘরের ভিতর নিকষ অন্ধকার, অথচ জলের কুঁজোয় ঠিক জায়গায় হাত পড়বে; শীত করছে—চাদরটা নিতে চাও আলনা থেকে, আলো জ্বালাবার দরকার হবে না। সব জ্যামিতিক নিয়মমতো সাজান আছে।

জয়ন্ত খুশি হয়। এমন স্ত্রীর উপরেও যে খুশি হতে পারে না—তাকে বর্বর ছাড়া কী বলা যেতে পারে আর? পারিবারিক জীবনে জয়ন্ত ভাগ্যবান। বন্ধুজনের ঈর্ষার বস্তু।

কিন্তু ওই পর্দাটা না টাঙালেই যেন ভালো করত এলা। ওইটুকু এলোমেলো জায়গা না হয় খোলাই থাকত তার জন্য।

অথচ কথাটা কিছুতেই গুছিয়ে বলা গেল না এলাকে। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে একবার আকাশের দিকে তাকাল জয়ন্ত, তারপর ক্লিষ্টভাবে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। অফিসের সময় হয়ে গিয়েছে।

ফিরতে পাঁচটা। বিকেল নিবু-নিবু। এই সময় পশ্চিম-মুখো জানালাটা দিয়ে শেষ রোদটুকু এসে ঈজিচেয়ারে পড়ে—রঙ-ধরা

আকাশে কাকেদের ঘরে ফেরবার তাড়া পড়ে যায়। ছাইয়ের তলায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া আগুনের মতো, লাল রঙটা হারিয়ে যায় সন্ধ্যের ভিতর। আরও পরে তারা ফুটতে থাকে দুটো একটা করে। তখন স্নান হয়ে গিয়েছে এলার—সাবানের মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে আর এক পেয়ালা চা নিয়ে এসেছে তার জন্য।

আজ ঘরে ঢুকেই একবার থেমে দাঁড়াল জয়ন্ত। আধখানা পর্দা দুলছে জানালায়। অন্য সময় হলে—অন্য যে-কোনও ঘরে হলে, পর্দাটা দেখে সে খুশি হত। ফিকে নীলের উপর জিরেনিয়াম জ্বল জ্বল করছে, বাইরের লালচে রোদে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে সেটাকে। তবুও আকাশ তার আড়াল হয়ে গিয়েছে। কোনও চলন্ত এরোপ্লেনের লাল-সবুজ বিন্দুদুটোকে চোখের দৃষ্টিতে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না আর, চৈত্র মাসের মেঘ উঠবে—কিন্তু রাজমুকুটের মত তার চূড়ো জয়ন্তের দেখার বাইরেই থেকে যাবে।

ফিকে নীলের উপর জিরেনিয়াম ছড়ান—বাইরের লাল রোদে অপরূপ। তবু জয়ন্তের চোখ জ্বালা করতে লাগল। এত সুন্দর, এত নিখুঁত লাগছে বলেই আরও অসহ্য লাগছে পর্দাটাকে। ইচ্ছে করছে একটা ছুরি দিয়ে এখানে ওখানে ওটাকে চিরে চিরে দেয় সে।

এলা ঘরে এল।

"কেমন, বলিনি তোমাকে? কী চমৎকার লাগছে পর্দাটা, বল ত?"

"হুঁ।"

জয়ন্ত বসে পড়ল চেয়ারে। কিন্তু জানালার দিকে তাকিয়ে নয়। আধখানা আকাশ তার সহ্য হচ্ছে না।

"কী, ভালো হয়নি?"

"খুব ভালো হয়েছে। এর চাইতে মানানসই পর্দা ওখানে আর

থাকতে পারত না”—জয়ন্ত চোখ তুলে তাকাল এলার দিকে, এক টুকরো দুর্বোধ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

একটু চুপ করে থেকে এলা বললে “কিন্তু তুমি খুশি হওনি। আমি বরং খুলেই ফেলি ওটাকে।”

অভিমান করেছে এলা, দুঃখ পেয়েছে। করুণা হল জয়ন্তের।

“না—না, খুলবে কেন! সত্যিই ভারী মানিয়েছে জানলাটাকে। ঘরের সঙ্গে ঠিক ম্যাচ্ করেছে। যেখানকার যা।”

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল এলা। জয়ন্তকে ঠিক বুঝতে পারল না। একবার মনে হল, থাক—পর্দাটা খুলেই ফেলা যাক। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠল না। সেই ফিকে নীল রঙ—সেই জ্বলজ্বলে জিরেনিয়াম—তার উপর লালের সেই বর্ণাভা। এলা বললে, “তোমার চা আনছি।”

জয়ন্ত জবাব দিল না।

পথে বেরুল আবার আধ ঘণ্টা পরে। তখন দুটি একটি করে তারা ফোটবার সময়। কিন্তু জানলা দিয়ে তাদের আর দেখবার জো নেই। পর্দার আড়ালে তারা ঢাকা পড়েছে।

আজও হেয়ার ক্রীমটা কেনা হয়নি। অফিস থেকে আসবার সময় আজও ভুল হয়ে গিয়েছে। সেইটে কেনবার জন্যই বেরিয়েছে জয়ন্ত।

কিন্তু তবুও কেনা হল না।

হঠাৎ মনে পড়ল, এই এক বছরের মধ্যে সে শ্যামবাজারে যায়নি। সেখানে ভূপেনবাবুর বাড়িতে এক সময় তার নিয়মিত তাসের আড্ডা ছিল। আজও পথে ঘাটে দেখা হলে দুঃখ করেন ভূপেনবাবু। বলেন, “বিয়ে ত সবাই-ই করে হে, রূপসী গুণবতী বউও কেউ কেউ পায়, কিন্তু তোমার মতো—”

জয়ন্ত আকস্মিকভাবে অনুভব করল, আজ তার তাস খেলাটা বড় বেশি দরকার। আজকের মত তাস খেলার প্রয়োজন তার

আর কোনদিন আসেনি। যদি এই ভারাক্রান্ত সন্ধ্যাটাকে হৈ হৈ করে ভরে তুলতে না পারে, যদি উদ্দাম হয়ে না উঠতে পারে খানিকক্ষণ, তা হলে নিজের অতি পরিচ্ছন্ন, অতি নিয়মিত—জানলায় অমন আশ্চর্য সুন্দর পর্দা-টাঙান ঘরখানাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। হয়ত—হয়ত এলাকেও তার খারাপ লাগবে!

কিন্তু এলাকে সে বলে এসেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে।

একবার দ্বিধা করল জয়ন্ত। তাকাল আকাশের দিকে। কেমন নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর লাগল। ফিকে নীলের উপর জিরেনিয়াম জ্বলছে। জয়ন্তের মনের প্রতিবিম্ব পড়েছে ওখানে।

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, হাত তুলে থামাল জয়ন্ত।

উঠে, একটুখানি ইতস্তত করে, তারপর পরিষ্কার গলায় বললে, 'শ্যামবাজার।'

টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি ছিল। তাতে এক গুচ্ছ লার্কস্পার, কিছু সুইট্ পী, গোটা কয়েক লাইলাক। মৃদু গন্ধ উঠছিল সুইট্ পী থেকে। সেই গন্ধটাকে অল্প অল্প আস্বাদন করতে করতে আমি বীয়ারের বিজ্ঞপ্তি-চিহ্নিত চীনে মাটির য়্যাশ্-ট্রেটার দিকে তাকিয়েছিলাম। তার ভেতরে ছাই আর নিকোটিন মেশানো খানিকটা হলদে জল, তুটো ফেঁপে ওঠা চুরুটের টুকরো, কয়েকটা পোড়া সিগারেটের কাগজ—আর লক্ষ্য করে দেখলাম ঠিক চারটে দেশলাইয়ের কাঠি। আমার মনে হল, আরো কাঠি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলো গেল কোথায় ?

ঘরের ভেতরে থুপ্ করে ছোট্ট একটা শব্দ হল। চোখ তুলে দেখলাম একটা বেড়াল। শাদা কালো হলদে মেশানো। বড় বড় গায়ের রোঁয়া—ল্যাজটা অনেকখানি ফাঁপানো। হয়তো পার্শিয়ান ক্যাটের রক্ত আছে কোথাও।

মেজেতে দড়ির ছেঁড়া কার্পেট। তার ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে বেড়ালটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠল প্রায় নিঃশব্দ গলাতে। বেড়ালটার প্রায় গলা পর্যন্ত দেখতে পেলাম আমি। অদ্ভুত রকমের ফ্যাকাশে লাল। লিপ্‌ষ্টিকের রঞ্জন না থাকলে বিলিতী মেয়ের ঠোঁট যে রকম দেখায়—ঠিক সেই রকম।

আরো এগিয়ে এসে আমার পায়ে সে মাথা ঘষতে লাগল। আর একবার ঠিক তেমনি করে ডাকল আমার দিকে তাকিয়ে। গুর্ গুর্ করে একটা চাপা আওয়াজও শুনতে পেলাম আমি।

ঘরে সুইট্ পীর গন্ধ। য়্যাশ-ট্রের বিচিত্র বর্ণ জলের মধ্যে দুটো ফাঁপা চুরুট। ঠিক চারটে দেশলাইয়ের কাঠি ভাসছে। আমার দুটো পায়ের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে আসা-যাওয়া করছে বেড়ালটা। এদের সব কিছু মিলিয়ে আমি একটা কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। কতগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া, টুকরো-টুকরো জিনিসকে জুড়তে চাইছিলাম এক সঙ্গে

চাপা যন্ত্রণার মত আর্তনাদ তুলে সামনের সুয়িং ডোরটা খুলল। পায়ের কাছ থেকে সরে গেল বেড়ালটা।

শাদা শাড়ীপরা দীর্ঘছন্দা একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো।

—নমস্কার।

আমি হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানালাম।

—ডক্টর সেনের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট্ ছিল ?

মাথা নাড়লাম।

—ক'টায় ?

—সাড়ে আটটা।

—আপনিই তো আশুতোষ রায় ?

আরো একবার মাথা নেড়ে জানাতে হল ও-নামটা আমারই বটে।

মেয়েটি বললে, ওঁকে একটু বিশেষ কাজে বেরুতে হয়েছে। উনি সেজন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। ফিরতে প্রায় ন'টা বাজবে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে ?

আমি একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আটটা বত্রিশ।

—না, কিছু না। আমার তাড়া নেই।

—ধন্যবাদ। আপনি ততক্ষণ এই কাগজগুলো দেখুন—ওপাশের একটা টিপয়ের ওপর থেকে মেয়েটি খানকতক পত্রিকা এনে আমার সামনে রাখল। তারপর ডাকল: স্টেলা ?

দড়ির ছেঁড়া কার্পেটের একপাশে, দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে গোল হয়ে শুয়ে পড়েছিল বেড়ালটা। ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল।

—বিয়িং নটি এগেন্। এখানে কেন ? গো আউট্—

স্টেলা পিঠটা বাঁকিয়ে একবার আড়মোড়া ভাঙল। সামনের দুটো থাবা বাড়িয়ে দড়ির কার্পেট আঁচড়ালো একবার। তারপর ও-পাশের জানালা গলিয়ে টুপ করে নেমে গেল বাইরে।

শাদা দাঁতের এক ঝলক হাসি বিলিয়ে মেয়েটি আবার বললে, ভেরি নটি।

চাপা আর্তনাদ তুলে সুইং ডোরের দরজা খুলল, বন্ধ হয়ে গেল। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল জুতোর আওয়াজ। দরজাটার দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। একটু একটু কাঁপছে দরজাটা—নক্‌শা কাটা কাচ জলের গায়ে ঢেউয়ের মতো দুলছে।

আর এক মিনিট এগিয়েছে হাতের ঘড়িতে। আরো সাতাশ মিনিট।

একখানা পত্রিকা খুললাম। রঙিন মার্কিন সাপ্তাহিক। হাওয়াই দ্বীপের একরাশ ছবি—স্নানার্থিণীদের বিশেষ ধরণের ফোটো। তাকিয়ে থাকবার লোভ হয়—অথচ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। পাতা উলটে যেতে হয় তাড়াতাড়ি।

গোটা কয়েক হিউমার। সচিত্র রকেট্ কাহিনী। স্ট্যালিনের ব্যঙ্গচিত্র।

আরো পনেরো মিনিট।

আর একটা কাগজ তুলে নিলাম। পত্রিকা নয়—মোটরের বিজ্ঞাপন। নানা রঙ—নানা চেহারা। ডি-ল্যুক্স, রেসিংকার, এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্—টু-সীটার! ভিয়েনার মোটর রেসে আমাদের গাড়ী ফার্স্ট হয়েছিল। এ বুন্ ফর দি মোটরিস্টস্—

সুইং ডোরের শব্দ। সেই মেয়েটি ফিরে এসেছে। হাতে এক পেয়ালা চা।

—নিন্—এক ঝলক শাদা হাসি। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। কিন্তু হাসিটা কেমন ফিকে মনে হয়। ঠিক স্টেলার মুখের মতো দেখতে। অবিকল। একটুখানি রঙের ছোঁয়া থাকলে ঠোঁটটা অত ফ্যাকাশে লাগত না।

আমি হাত বাড়িয়ে চা নিলাম।

মেয়েটি তখনই চলে গেল না। টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো —ফুলদানির ফুলগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে দিলে আর একবার। য়্যাশ-ট্রেটাকে একটু এগিয়ে দিলে টেবিলের মাঝখানে। আমি অকারণে আশঙ্কা করতে লাগলাম, ও-থেকে খানিকটা বিশ্রী ময়লা জল নীল টেবিল-ক্লথটার ওপরে ছলকে পড়বে।

—আপনি ডক্টর সেনের বাল্যবন্ধু—না ?

আমি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিলাম। মাথা তুলে বললাম, কলেজেও পড়েছি একসঙ্গে। আই-এস্‌সি পর্যন্ত।

—খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন। আর কবিতা লিখতেন।

আমি আশ্চর্য হলাম। এত খবর মেয়েটির জানবার কথা নয়। অশোক ওকে অনেক কথাই বলেছে আমার সম্পর্কে। কিন্তু কে এই মেয়েটি ? অশোকের স্ত্রী ? কিন্তু অশোক ব্যাচেলর। ভাবী স্ত্রী ? যতদূর জানি—বিয়ে করবার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত অশোকের কোনো উৎসাহই নেই! তা হলে নার্স ? আর তা না হলে—

সুইট্-পীর দিক থেকে আমার চোখ নেমে এল, য়্যাশ-ট্রের হলদে কালো জলের মধ্যে। দুটো চুরুটের মোটা মোটা টুকরো ভাসছে। কেমন বীভৎস লাগল। একবার শোন নদীতে আমি একটা মড়া ভাসতে দেখেছিলাম। মাথা আর পা দু'টো দেখতে পাইনি—জলের তলায় ডুবে ছিল তারা ; শরীরের বাকীটা অমনি ফুলে উঠে স্রোতের টানে টানে এগিয়ে চলেছিল—ঠিক ওই চুরুটগুলোর মত।

আমার মনে হল, মেয়েটির কথার এখনো জবাব দেওয়া হয় নি।

—কব্জি ভাঙবার পর ক্রিকেট্ খেলা ছেড়ে দিয়েছি। শেষ কবিতা বেরিয়েছিল কলেজ ম্যাগাজিনে। এখন ইন্‌সিয়োরেন্সে চাকরি করি।

মেয়েটি আমার দিকে তাকালো। দুটো গভীর চোখ। চোখের তারার রঙ আরো একটু কালো হলে ভালো হত।

—কবিতা না ছাড়লেই পারতেন। চাকরি করলে কি আর লেখা যায় না ?

বারো বছর আগে কেউ এমন একটা কথা বলতে পারত। এমনি একটি মেয়ে। কিন্তু সেদিন এমন মেয়ে জীবনের কোথাও ছিল না ; ছিলেন বাবা—যাঁর পেন্‌শনের টাকা একশোর এদিকে ; দুটি বোন ছিল—যাদের বিয়ে না দিলে চলে না ; আর ছিল একটি ভাই—যে ম্যাট্রিক পড়ত।

সুইং ডোর দুলে উঠল। সেই চাপা আর্তনাদের আওয়াজটা। আরো তীক্ষ্ণ, আরো কর্কশ। খানিক কাশির শব্দ। আমাদের দুজনের চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল দরজার দিকে।

আর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। মাথায় ছাই রঙের বিশৃঙ্খল চুল। চোখে ঘষা কাচের মতো পুরু চশমা। ময়লা একটা মুগার চাদর গলায় পাকে পাকে জড়ানো। হাতে বেতের লাঠি। পায়ে কোথাও গোলমাল আছে—একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই ঢুকলেন ভেতরে।

—ডক্টর সেন আছেন ?

—এখুনি আসবেন, বসুন।

আমি চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলাম। কোথায় একটা রঙিন সুতো কেটে গেছে বলে মনে হল। লাইলাকের পাপড়িগুলো কাঁপছে অল্প অল্প—জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। সুইট্‌পীর গন্ধ ধূপের মত ছড়াচ্ছে চারদিকে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। সব যেন একটা রঙিন সুতো দিয়ে মালার মতো গাঁথা ছিল। সেই সুতোটা কেটে গেল।

মেয়েটি আবার বললে, বসুন।

সুইং ডোর খুলে গেল। মেয়েটির চলে যাওয়া পা দুটি দেখতে পেলাম ওপারে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম লাল চটি ছিল ওর পায়ে।

ভদ্রলোক আমার সামনে এসে একটা সোফায় বসলেন। মুখোমুখি। খুক খুক করে কাশলেন বারকয়েক। বুড়ো বয়সের পুরোনো ক্রনিক কাশি।

—আপনিও ডক্টর সেনের জন্যে ওয়েট্ করছেন তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রিপোর্ট নিতে এসেছেন ?

—না, আজকে ব্লাড দিয়ে যাব।

—কান্ টেস্ট্ ?

আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। রুক্ষ ভাবে বললাম, না, ওসব কিছু নয়। আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি।

—ওঃ।—ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন মিনিটখানেক। তারপর বললেন, রক্ত দিতে আপনার খারাপ লাগবে না ?

—ঠিক জানি না। এর আগে কখনো দিইনি।

—কতটা দেবেন ?

কথার জবাব দিতে ইচ্ছে করছিল না। এতক্ষণে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। য়্যাশ-ট্রের জলে আগুন নেভার একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ শোনা গেল। পাঁচটা কাঠি ভাসছিল এখন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আমি উপেক্ষার ভঙ্গিতে বললাম, সামান্যই।

—আমি দিয়েছি টু সি-সি। আজ রিপোর্ট পাব। ব্লাড্-সুগার।

—ও।

ভদ্রলোক এদিক ওদিক তাকালেন। কী মনে করে ফুলদানী থেকে সুইট্ পী ছিঁড়ে নিলেন একটা। ভারী খারাপ লাগল, ভারী খারাপ লাগল আমার—প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করল। মনে

পড়ে গেল ছেলেবেলায় একজনকে দেখেছিলাম হাতের তেলোয় একটা প্রজাপতিকে পিষে ফেলতে। এই ভদ্রলোকও ফুলটাকে নিয়ে এখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বেন খুব সম্ভব।

—উঃ, অত টেস্ট্‌টিউব! ওদের কোন্‌টার ভিতরে আমার রক্ত আছে কে জানে।

আমি ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। সামনে ছিল লাইলাক্‌-লার্কস্পার-সুইট্‌পী, য়্যাশ্‌ট্রের জলে দুটো চুরুট আর চারটে কাঠি ছিল।

পায়ে পায়ে মাথা ঘসছিল স্টেলা আর সেই মেয়েটি আসছিল ঘুরে ঘুরে। এতক্ষণ আমি দেখতে পাইনি।

একটা কাঠের র‍্যাক্‌। তার থাকে থাকে খোপে খোপে টেস্ট্‌টিউব। কয়েকটা খালি, দু-একটাতে হলদে রঙের তরলসার, বাকীগুলিতে রক্ত। তুলোর ছিপি আঁটা টেস্ট্‌টিউবে লাল জমাট রক্ত। গা শির শির করে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন, কী নেই ওতে? ম্যালেরিয়া—টি. বি—টাইফয়েড্‌—ভি. ডি—

সকালটা শীতের। তবু এখন আমার কেমন গরম লাগতে লাগল। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম পাখাটা এখনো আছে সেখানে। ইচ্ছে করলে সেই মেয়েটি এসে খুলে দিতে পারত। মানুষের রক্তকে অমনভাবে সাজানো থাকতে দেখলে এত অস্বস্তি লাগে কেন, কে জানে।

ভদ্রলোক আবার খুক খুক করে কাশলেন। পুরোনো—ক্রনিক কাশি। তবু বলা যায় না—টি-বি-রও হতে পারে। আমি নিজেকে আরো সংকীর্ণ সংকুচিত করে বসলাম। ভদ্রলোক প্রায় মিনিট দুই কাশলেন, ময়লা জামার আস্তিনে মুছলেন মুখটা, তারপর বলে চললেন, রক্ত একটা স্ট্রেঞ্জ সাইট্‌। অদ্ভুত লাগে দেখতে। ধরুন, একটা য়্যাকসিডেণ্ট বা খুন হয়েছে—অথচ বডিটা সেখানে

নেই। খালি পড়ে আছে একরাশ রক্ত। এ রকম দেখেছেন কখনো ?

—না।

—আমি দেখেছি। শীতের রাত—প্রায় এগারোটা তখন। আমি একটা ডবল-ডেকারের দোতলায় বসেছিলাম। ধর্মতলার মোড়ে বাঁক নিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক সামনেই সাবেকি ধাঁচের একটা অচল ফাঁকা ট্রাম। তার তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এসে ফুটপাথ ঘেঁষে ঝাঁঝরিতে নেমেছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল এক কলসী জল ঢেলেছে কেউ, তারপরে বুঝলাম ওটা রক্ত। কি রকম যে লাগল দেখতে। শীতের রাত—ফুটপাথে লোক নেই বললেই হয়—এর মধ্যে কোত্থেকে একটা কালো কুকুর এসে রক্তটা চাটছিল।

ভদ্রলোক শুধু কথা বলছিলেন না—ওঁর চোখ-মুখ একসঙ্গে যেন বর্ণনা দিচ্ছিল। এত অল্প কথায়—এমন কুশ্রী অভিব্যক্তিতে এ রকম বীভৎস বিবরণ আমি কখনো শুনিনি।

আমার গরম লাগতে লাগল। জোর করে ফুলদানির দিকে চোখের দৃষ্টি আটকে রাখতে চাইলাম। বাইরে থেকে অল্প অল্প হাওয়া আসছে, লাইলাকের পাপড়ি কাঁপছে, সুইট্-পীর গন্ধ ছড়াচ্ছে ধূপের মতো—কিন্তু আমার গরম লাগতে লাগল। যে কেউ এখন এসে ঘরের পাখা খুলে দিতে পারত। যে-কেউ।

ভদ্রলোক বললেন, টেস্ট্-টিউবগুলোকে অমনভাবে চোখের সামনে সাজিয়ে রাখবার কোনো মানে হয় না। ওরা অনেক রকম স্মৃতি নিয়ে আসে। জানেন সেই রক্তের ধারাটাকে দেখবার পর সমস্ত রাত আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি একটা ট্রেন-য্যাকসিডেন্টে মরে গিয়েছি। আমার হাত-পাগুলো—

চাপা গলায় প্রায় চীৎকার করে উঠলাম আমি।

—কী বকছেন আপনি ! চুপ করুন।

এই আকস্মিক রূঢ়তার আঘাতটা যতখানি গিয়ে লাগবে বলে মনে হয়েছিল, তার কিছুই হল না। ভদ্রলোক ঘষা কাচের মতো চশমার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইলেন। সম্মোহনের সময় যাদুকরের চোখ যেমন আস্তে আস্তে দুটো কুয়াশার বৃত্তে পরিণত হয়ে যায়—ঠিক সেই রকম।

—এমনি বলছিলাম।—আস্তে আস্তে বললেন তারপর। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ল আরো বার কয়েক—স্বগতোক্তির মতো কিছু উচ্চারণ করলেন—আমি শুনতে পেলাম না।

ফুলদানি থেকে য়্যাশ-ট্রে। তবু খানিকটা বিবর্ণ জলের ভেতরে—যেখানে দুটো ফাঁপানো চুরুটের টুকরো আর পাঁচটা কাঠি ভাসছে—তার মধ্যেও দৃষ্টিকে আটকে রাখতে পারছি না। সেই কাঠের র‍্যাকটায় সারি সারি টেস্ট্ টিউব। জমাট বাঁধা রক্ত। লাল ফ্রাইব্রোজেন। আমার রক্তও থাকবে ওদের সঙ্গে।

আমি আশুতোষ রায়। এক সময়ে ক্রিকেট খেলেছি। ব্যাট্ নিয়ে মাঠে নামলে হাততালি পড়ত চারদিকে। আমি একদা কবিতা লিখতাম। বারো বছর আগে যে কোনো একটি মেয়ে আমার জীবনে নেমে এলে সেই কবিতা বেঁচে থাকতে পারত; হয়তো আমার চারদিকের পৃথিবীতে আজো বেঁচে থাকত, নতুন ঘাস, প্রথম ফুল, সকালের শিশির।

আমার রক্তও ওখানে সাজানো থাকবে—টেস্ট্ টিউবে। পাশে থাকবে টাইফয়েড্—টি-বি—ভি-ডি—ডিপ্থিরিয়া—

ওখানে কোন্ টিউবটা আমার জন্যে? আমার রক্তে কিসের স্পেসিমেন?

—কী ভাবছেন?—নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

—কিছু না।

—আসলে কী জানেন?—একটা কাশির দমক সামলে নিয়ে

ঘড়ঘড়ে গলায় ভদ্রলোক বললেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা টেস্ট-টিউব। আছড়ে যখন ভেঙে পড়ি—তাকেই বলি য়্যাক্সিডেণ্ট। নইলে অমনি করে তুলো এঁটে পড়ে থাকা—অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া—তারপরে স্লাইড্—কিন্তু কী রেজাল্ট? কেউ জানে না।

ফ্যান্সি? দার্শনিকতা? যা খুশি বানিয়ে বলে যাওয়া? কিন্তু আমি সোজা হয়ে উঠে বসলাম। বিশ্রী গরম লাগছে। আমি আশুতোষ রায় নই। কেউ নই। শুধু একটা নিষ্ঠুর শক্তি পেছন থেকে ঠেলে চলেছে আমাকে। শেষ আর্তনাদের মতো শব্দ করে খুলে যাচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া একটা সুইং ডোর—একটা অনন্ত ল্যাবরেটরি; তারপর টেবিলে লাইলাক্—লার্কস্পার্—সুইট্পী, য়্যাশট্রের জলে স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ; আর নির্মমতা-ছলনার মতো পায়ে মাথা ঘষছে স্টেলা—সেই মেয়েটি এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—যার পায়ে লাল চটি।

র‍্যাকে সাজানো আরো একটা টেস্ট্-টিউব হওয়ার আগে আমি আরো কিছু করতে পারি; এ ছাড়াও জীবনের আরো কোনো নিগূঢ় নিবিড় অর্থ আছে; কিন্তু সে অর্থ আমি কোথায় খুঁজে পাব?

অসম্ভব গরম লাগছে। সিগারেটের আগুন এসে আঙুল ছুঁয়েছে। সিগারেটটাকে য়্যাশ-ট্রের মধ্যে ছেড়ে দিলাম—নিবন্ত আগুনের শেষ ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। আমাকে অন্তত একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যেখানে লাইলাক্ নয়—ধুলোর গন্ধ; লাল চটি নেই—ওপরে নীল আকাশ।

কিন্তু তার আগে আবার আর্তনাদ করল সুইং ডোর। বেরুবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে অশোক।

—সরি, আমার একটু দেরী হয়ে গেছে।

দেবী আমারও হয়ে গেছে। সময় ছিল। কিন্তু সুইট্-পীর গন্ধ ছিল, স্টেলা ছিল, আর সেই মেয়েটিও ছিল। আমি আমার পরিণামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

কপালের ঘাম মোছবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে আমি আবার চেয়ারটার ওপরেই বসে পড়লাম। ঘড়ঘড় করে গলার ভেতরে বিশ্রী আওয়াজ টেনে কাশতে শুরু করলেন সেই ভদ্রলোক।

এই নিয়ে খুকু পর পর পাঁচদিন দেখল সাপটাকে। ঠিক এই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে আসবার মুখে, এই কনে-দেখা আলোর লালচে আভায়, পোড়ো ইটের পাঁজাটার চেহারাটা অন্ধকারে ভূতুড়ে হয়ে যাওয়ার আগে, বড় কাঠবাদাম-গাছটার ডাল থেকে বাদুড়গুলোর উড়ে যাওয়ার সময়।

তখন হাওয়ায় ধুতরো ফুলের মতো কিসের একটা গন্ধ। বিকেল বেলার গন্ধ। তখন কাকের ডাকাডাকিতে কান্নার মতো কী যেন শোনা যায়। মাঠের ওপারে সূর্যটা একখানা বড় লাল থালা হয়ে যায়, তারপরেই কোথায় যেন ডুবে যায় টুপ করে। এই সময়েই খুকু দেখতে পায় সাপটাকে।

পর পর পাঁচদিন দেখল।

পোড়ো ইটের পাঁজার একটা কোনা থেকে সে বেরিয়ে আসে। ছোট্ট একটা মুখ দেখা যায় প্রথমে—মনে হয় গিরগিটি ; চেরা জিভটা একবার ভিতরে টেনে নেয়—আবার বের করে। ঘাড় ঘুরিয়ে সতর্কভাবে দেখে নেয় চারদিক, দুটো কালো বোতামের মতো চোখ অলসভাবে দু-একবার লক্ষ্য করে খুকুকে। তারপর আস্তে আস্তে শরীরটা তার লম্বা হতে থাকে, ইটের উপর দিয়ে সেটা ক্রমশ বেরিয়ে আসে, খুকুর মনে হয় বুঝি আর কোনোদিনই শেষ হবেনা। হঠাৎ এক সময় মস্ত সাপটা যেন লাফিয়ে পড়ে পথের উপর, মাথাটা তুলে আর-একবার লক্ষ্য করে আশেপাশে, ধীরে ধীরে ধুলোভরা পথটার উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে ও-ধারের পুরনো দিঘিটার মধ্যে গিয়ে নামে। খুকুর চোখ তখনো অনুসরণ

করে তাকে। দিঘির কালো জলে ছলছল করে খানিকটা শব্দ হয়, তারপর পদ্মপাতা আর কল্‌মিলতার বনে যে সে কোথায় মিলিয়ে যায়, খুকু আর তাকে দেখতে পায় না।

কাঠবাদাম গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন ভারী ভয় করেছিল খুকুর। ভেবেছিল চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু দুটো কালো বোতামের মতো সাপটার উজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। কনে-দেখা আলোয় অদ্ভুত সুন্দর মনে হল সাপটাকে। দিঘির জলে নামবার আগে সে একবার ফণা তুলেছিল ; বিকেলের রঙ পড়ল তার উপর, সোনালী পদ্মের মতো কী একটা ঝকমক করে উঠল সেখানে।

ওটা কী, খুকু জানে। তাদের বাড়িতেই তো সাপুড়ে এসেছে কতবার। পেটমোটা তুবড়ি বাঁশি বাজিয়ে, হাত দুলিয়ে দুলিয়ে দেখিয়েছে সাপখেলা, গলা মোটা করে গান গেয়েছে ঃ "অ গো মা, মনসা গো!" তখন অনেক সাপের ফণা দেখেছে খুকু—দেখেছে তাদের উপরে অদ্ভুত চিহ্নগুলো।

মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

"ওটা কেষ্ট ঠাকুরের পায়ের ছাপ। যখন কালীয় নাগ দমন করেছিলেন, সেই তখনকার।"

খুকু জানে। তবু এই বিকেল বেলায়, মস্ত থালার মতো লাল সূর্যটা হঠাৎ যখন টুপ করে ডুবে যায়, আর হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো ধুতরোর মতো বিকেলের গন্ধ ভাসে, আর কাঠবাদাম গাছটার ডাল থেকে ঝুপ করে এক-একটা বাদুড় উড়ে গেলে কাকের ডাকাডাকি যখন কান্নার মতো শোনায়, তখন সাপটার মাথার চিহ্নটা সোনালী পদ্মের মতো এমনি ঝলমল করে ওঠে যে, খুকুর ও-কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

তখন অন্য কথা মনে হয়। মনে হয় ঃ সাপের মাথার মণির

গল্প। ওটা কেষ্ট ঠাকুরের পায়ের ছাপ নয়, সেই সাত রাজার ধন এক মানিক। এই পাঁচদিন ধরে সে-বিশ্বাসটা যেন আরো জোরালো হয়েছে। খুকু অনুভব করে, সাপটার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে, ও চিনে নিয়েছে তাকে। কালকেই তো যাওয়ার সময় কেমন ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ করে দেখে গেল তাকে, চেরা জিভটা লকলক করে উঠল কয়েকবার, মনে হল যেন অল্প একটু হেসে তাকে বলে গেল : "এই যে লক্ষ্মী মেয়েটি, বেশ ভালো আছ তো ?"

রাত্রে ঘুমুবার আগে, জানলা দিয়ে তারা দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত আশার উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসে। খুকু ভাবে, একদিন ঠিক সাপটা তার সামনে এসে ফণা তুলে দাঁড়াবে, ঠিক মানুষের ভাষায় বলবে : "শোনো খুকু—তোমাকে ভারী পছন্দ হয়েছে আমার। বড্ড ভালো মেয়ে তুমি। তাই আমার মাথার মণিটা তোমায় দিতে এলাম। টুক্ করে তুলে নাও—এখুনি।"

খুকুর মাথার ভিতরটা দপদপ করতে থাকে। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পর্যন্ত। জানলার বাইরে কালো আকাশের তারাগুলো এক-একটা করে মণি হয়ে যায়। তারও পরে—আরো কিছুক্ষণ না-ঘুম-না-জাগার মধ্যে খুকু স্বপ্ন দেখে তার হাতের মুঠোয় ওই সাতরাজার ধন এক মানিকটা ঝকঝক করে জ্বলছে। ওই মণিটা নিয়ে যা খুশি করতে পারে খুকু। তাদের এই পুরনো দোতলা বাড়িটা এখুনি রাজপ্রাসাদ হয়ে যেতে পারে, তাদের ঘরের পুরনো মস্ত এই তক্তপোষটা সোনার পালঙ্ক হয়ে যেতে পারে। আরো কী কী হতে পারে ভালো করে মনের সামনে ফুটে ওঠার আগেই কখন ঘুমের ভিতরে ডুবে যায় খুকু।

কাউকে বলেনি সে। বাড়ির আর কাউকে সে বিশ্বাস করে তার গোপন কথাটা বলতে পারেনি। আজ এক সপ্তাহ ধরে ঠিক এমনি সময়ে সে এই কাঠবাদাম গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায়।

মাঝে শুধু দু'দিন সাপটাকে দেখতে পায়নি; হয়তো অসুখ করেছিল, হয়তো বেড়াতে গিয়েছিল কোথাও।

চেনা হয়ে গেছে। ওর মুখ বাড়ানো, সতর্ক নেমে আসবার ভঙ্গিটা, তারপর ধুলোভরা পথটার উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে রেখা টেনে টেনে দিঘির জলের মধ্যে নেমে যাওয়া। কোথায় যায় সাপটা? ওই দিঘির নীচে কি সেই রূপকথার গল্পে পড়া নাগকন্যার দেশ? মণির আলোয় পথ ঝলমলিয়ে সেই গল্পের দেশেই কি চলে যায় ও? একদিন যখন মণিটা ও খুকুর হাতে তুলে দেবে, সেদিন খুকুও কি—

আজও কাঠবাদাম গাছটার নীচে খুকু সাপটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। বেলা ডুবে আসছে, সূর্য লাল হয়ে যাচ্ছে, তারপরেই এক ঝলক সোনালী আলো পড়বে ইটের পাঁজার উপর। গাছের ডালে বাদুড়গুলো ছটফট করছে। কয়েকবার ডেকেও উঠল কর্কশ গলায়।

সাপটার বেরিয়ে আসবার সময় হয়েছে প্রায়।

ঠিক তখনই সেই লোকটা এল।

মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল, দু'কানে দুটো পিতলের আংটি। গায়ের ময়লা ফতুয়ার উপর গলায় কাচ আর কড়ির মালা। ভুরু দুটো মোটা আর ছাই রঙের। এক হাতে একটা সাত-বাঁকানো কাঠের লাঠি, যেন মস্ত একটা সাপকে ধরে রেখেছে মুঠোয়। কাঁধে গেরুয়া রঙের থলি ঝুলছে।

জ্বলজ্বলে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলে, "কী করছ খোঁকী এখানে?"

"এমনি দাঁড়িয়ে আছি।"

"এখানে দাঁড়াতে নেই—বহুৎ খারাপ জায়গা। কোথায় থাকো তুমি?"

লোকটাকে ভালো লাগল না খুকুর। আরো খারাপ লাগল ওর

হাতের লাঠি আর কাঁধের ঝোলাটা। খুকু জানে। ঠিক এই রকমই চেহারা হয় ছেলেধরাদের।

অন্য সময় হলে খুকু ঠিক পালিয়ে যেত এখান থেকে। সোজা দৌড় দিত বাড়ির দিকে। কিন্তু এখুনি যে বেরিয়ে আসবে সাপটা। তার সাপ। কনে-দেখা আলোয় তার মাথায় পদ্মের মতো কী একটা ঝিকিমিক করে উঠবে। সেটা কেষ্ট ঠাকুরের পায়ের চিহ্ন নয়। সাতরাজার ধন এক মানিক।

লোকটা কেন চলে যাচ্ছে না এখান থেকে ?

"তোমার বাড়ি কোথায় খোঁকী ?"

আবার প্রশ্ন এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিলে : স্-স্-স্—

পুরনো ইটের পাঁজার উপর কমলালেবু রঙের আলো পড়েছে। সেই আলোয় গিরগিটির মুখের মতো বেরিয়ে এসেছে চেনা মাথাটা। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাপটা সড়াক করে নেমে পড়ল।

আর তখুনি একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। বাবরিওলা লোকটা যেন একেবারে ছোঁ দিয়ে পড়ল সামনের দিকে। খুকু ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেখতে পেল, সাপটার প্রকাণ্ড ফণা প্রায় আধ হাত চওড়া হয়ে উঠেছে—জ্বলছে তার মাথার পদ্মরাগ মণি। লোকটা তৎক্ষণাৎ তার বাঁকা লাঠিটা ঠেসে ধরল সাপের মাথার উপর, আর এক হাতে আঁকড়ে ধরল মুখটা।

খুকু একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে, যন্ত্রণায়।

লোকটা মুখ তুলে হাসল : "কোনো ভয় নেই খোঁকী—ধরে ফেলেছি শয়তানের বাচ্চাকে। বহুৎ বড়া খরিশ—কম্‌সে কম সাড়ে চার হাত হোবে। একবার কাউকে কাট্‌লে—ব্যাস্—"

একটা বিশ্রী অট্টহাসিতে ভরে তুলল চারদিক। কাঠবাদাম গাছ থেকে একদল বাদুড় উর্ধ্বশ্বাসে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল

অদ্ভুত কায়দায় সাপের মুখটা চেপে ধরে লোকটা সেটাকে জড়িয়ে নিয়েছে সাত-বাঁকানো লাঠির পাকে পাকে। ডান হাতের পেশী আর রগগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে লোকটার।

হাসি থামিয়ে বললে, "তাই বলছিলুম খোঁকী—বাড়ি চলে যাও। সাঁঝবেলায় এসব জায়গায় আসতে নেই। ভারী খারাপ জায়গা—"

পরক্ষণেই রাস্তা পার হয়ে দিঘির ধার দিয়ে একরাশ আকন্দ ঝোপের আড়ালে চট করে কোথায় মিলিয়ে গেল লোকটা।

সেদিন সারারাত খুকু ঘুমুতে পারল না। থেকে থেকে একটা চাপা কান্না ফেটে পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। লোকটা তার সাপকে ধরে নিয়ে গেছে, কেড়ে নিয়ে গেছে সাপের মাথার মণি। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা তারা নেই, সব ঢেকে গেছে মেঘের আড়ালে।

যন্ত্রণা। এ-যন্ত্রণা কাউকে বলা যাবে না, কেউ বুঝবে না।

তের বছর পরে বাইশ বছর বয়েসের খুকু আবার সেই যন্ত্রণার স্বাদ পেল। নতুন করে।

মহীন তখন সরে গেছে দরজার কাছে। ইলেক্‌ট্রিকের নীলচে আলো তার চশমার কাচের উপর মণির মতো জ্বলছিল। মহীনের চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

মহীন শেষ চেষ্টা করলে। ঝাপসা গলায় বললে, "আপনি বুঝতে পারছেন না—"

"বুঝতে পারছি না?" হাতের বেতের ছড়িটা মেজেয় ঠুকে দাদু গর্জন করে উঠলেন, "বুঝতে পারছি না? এর পরেও তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছ? তু-তুটো মেয়েকে পথে বসিয়ে এখন এসেছ আমার বাড়িতে ঢুকতে? ভেবেছ তোমার মতো লোফারের

হাতে নিজের নাত্‌নিকে তুলে দেব আমি? বেরোও—গেট্‌ আউট্‌—"

সম্পূর্ণ পরাভূত মহীন অসহায় ক্ষোভে বললে, "আচ্ছা—আচ্ছা—দেখা যাবে—"

তারপরেই দরজা দিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। চিরদিনের মতো চলে গেল এ-বাড়ি থেকে। খুকু জানে, মহীন আর কখনো এখানে ফিরে আসবে না।

দাদু আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন খুকুর কাঁধের উপর।

"ভারী কষ্ট হচ্ছে—না দিদি? ও যে এত বড় সাংঘাতিক, তা জানতিস না? কী করবি ভাই, দুঃখ পেয়ে পেয়েই তো জীবনকে চিনতে হয়। ভেবে দ্যাখ্‌—কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল আর একটু হলেই। যদি আগেভাগেই খোঁজ-খবর না করতাম, যদি চকচকে চেহারা আর ভালো ডিগ্রি দেখেই—"

দাদু থেমে গেলেন। খুকু কাঁদছিল। অঝোরে কাঁদছিল।

তের বছর আগেকার সেই বেদনা তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে নতুন করে। সেই যন্ত্রণা যা কেউ বুঝবে না, যা কাউকে বোঝাবার নয়।

সাপকে ভয় করে সকলেই, কিন্তু সাপের মাথার মণির সন্ধান পায় ক'জন? শুধু খুকু পেয়েছিল। সে-মণি পৃথিবী তার কাছে থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

একবার নয়। বার বার॥